২

কবিতা

সাহিত্য জগতের প্রধান শিল্পরূপ হচ্ছে কবিতা। মানুষ তার চেতনার উন্মেষকাল থেকেই কল্পনাশক্তি ও ভাষার সাহায্যে কবিতা রচনার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ কবিতায় রচিত। কালের ধারায় বাংলা কবিতা বিকশিত হয়েছে মানবমন, সমাজজীবন ও প্রকৃতির রূপরস অবলম্বন করে; প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর বিচিত্র ধারা প্রসারিত। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক জীবন-প্রতিবেশে সূচিত হয় পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের অনুপ্রেরণা-ঋদ্ধ একটি আধুনিক ধারা, তবে স্বদেশের জীবন ও নিসর্গই ছিল এই কবিতার ভাব ও রূপবৈচিত্র্যের মূল উপাদান।

ইউনিট-২ এ আপনি কবিতার এই আধুনিক ধারার ক্রমবিবর্তিত রূপের সঙ্গে পরিচিত হবেন, বিষয়বস্তু ও কাব্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবেন। এখানে বাংলা কবিতার পাঁচজন প্রধান কবির পাঁচটি বিশিষ্ট কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে, যা উনিশ ও বিশ শতকের ধারা-নির্দেশক। নিম্নোক্ত বিন্যাসক্রমে কবিতাসমূহ আলোচনা করা হল।

- *পাঠ-১. বঙ্গভাষা*
- *পাঠ-২. বলাকা*
- *পাঠ-৩. বাতায়ন পাশে গুবাক-তরুর সারি*
- *পাঠ-৪. বনলতা সেন*
- *পাঠ-৫. অমর একুশে*

পাঠ-১

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪-১৮৭৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি—

◆ কবিতাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

◆ কবিতায় অলংকার, ছন্দ ও ভাষা কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

◆ কবিতাটির কাব্যমূল্য কতটুকু, তা বিশেষণ করতে পারবেন।

লেখক-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪-১৮৭৩] বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ধারার প্রবর্তক। অসাধারণ মেধা, সুগভীর পান্ডিত্য ও প্রতিভা নিয়ে তিনি কবিতার মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ রূপরীতি ভেঙে আধুনিক যুগের সূচনা করেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যেও রয়েছে তাঁর ট্র্যাজিডি ও প্রহসন রচনার অসামান্য কৃতিত্ব। তিনি যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতা জাহ্নবী দেবী। রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন সফল উকিল, উন্নতিশীল বিত্তবান মধ্যবিত্ত। বাল্যকালে মধুসূদন পারিবারিক স্নেহমমতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি মায়ের কাছে পাঠ করেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বাংলা কাব্য। এর ফলে দেশজ সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর পরিচিতি ঘটে, পরবর্তীকালে এই পরিচয়ই তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাকে করে তোলে স্বদেশের মর্মমূলে প্রোথিত এবং ঐতিহ্যলগ্ন।

তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় উপনিবেশ-কলকাতার বর্ণাঢ্য নগর প্রতিবেশে। তৎকালীন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পীঠস্থান কলকাতার চিন্তাচেতনার আলোক, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্যের সংস্পর্শ ও বিলাস-বৈভব তাঁর চিত্তকে করে প্রভাবিত। গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি প্রায় তের চৌদ্দটি ভাষা আয়ত্ত করে মধুসূদন হয়ে ওঠেন পান্ডিত্য ও রসজ্ঞানে প্রাণবন্ত। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনার প্রয়াস ছিল, ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংরেজি ভাষার বড় কবি হওয়ার বাসনায় তিনি খ্রিষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চার নিদর্শন Captive Ladie, Visions of the Past প্রভৃতি [১৮৪৮-৪৯]। কিন্তু ১৮৫৮-৬২ সময়পর্বে মধুসূদন বাংলা ভাষায় রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ও নাটকসমূহ। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রবাসজীবনে সৃষ্টি করেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য** [১৮৬০], **মেঘনাদবধ কাব্য** [১৮৬১], **ব্রজাঙ্গনা কাব্য** [১৮৬০], **বীরাঙ্গনাকাব্য** [১৮৬১] ইত্যাদি এবং নাটকসমূহ **শর্মিষ্ঠা** [১৮৫৯], **একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ** [প্রহসন জাতীয় রচনা ১৯৫৯], **পদ্মাবতী** [১৯৬০], **কৃষ্ণকুমারী** [১৯৬১], **মায়াকানন** ইত্যাদি। মহাকাব্যের ক্ল্যাসিকরীতি, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট, ট্র্যাজেডি, প্রহসন ইত্যাদি বিচিত্র আঙ্গিক প্রবর্তনে মধুসূদন যুগন্ধর-প্রতিভা, এসব ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ।

বিচিত্র জীবনযাপন ও বিপর্যয়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবনকাল। ধর্মান্তরের ফলে পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। মধুসূদন প্রথমে এক ইংরেজ নীলকরের কন্যা রেবেকা ম্যাকটাভিসকে বিবাহ করেন। পরবর্তী সময়ে এমিলিয়া হেনরিএটা সোফিয়া নামের ফরাসি যুবতীকে পত্নী হিসেবে বরণ করেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই [১৮৪৮-১৮৫৬] শিক্ষক, সাংবাদিক ও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন, কিন্তু অর্থ-উপার্জনে খুব সফল হননি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার ফলে তিনি পরিবারসহ দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। জীবনের শেষ প্রান্তে রচনা করেন **হেক্টরবধ কাব্য** [১৮৭১]; ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগাক্রান্ত মধুসূদনের শেষজীবন ছিল দুঃসহ ও দুর্ভাগ্যজনক। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ জুন তিনি পরলোক গমন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিচিত্র প্রতিভা ও প্রথম আধুনিক কবির পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', এবং সুরেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে।

পাঠ- পরিচিতি

মধুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি 'চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থানকালে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সনেট রচনায় ব্রতী হন, এই রচনাসমূহ 'চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী' গ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তবে আলোচ্য কবিতাটি প্রথমে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টম্বর-অক্টোবর মাসে 'কবি-মাতৃভাষা' নামে লিখিত হয়েছিল, এটি পুণর্লিখিত হয়ে 'বঙ্গভাষা' নামে উক্ত গ্রন্থভুক্ত হয়।

মূলপাঠ

হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;-
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষী কয়ে দিলা পরে-
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

◆ ◆

বস্তুসংক্ষেপ

বাংলা ভাষার সাহিত্যভান্ডার বিচিত্র সম্পদে পরিপূর্ণ, কিন্তু কবি সেসব বৈভবকে অবহেলা করে নির্বোধের মত পরের সম্পদ আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যচর্চার জগতে পরিভ্রমণের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এ ছিল কবির জীবনের এক অনভিপ্রেত সময়, বিফল সাধনায় মগ্ন থাকার মরীচিকা মাত্র। কারণ পরভাষায় বড় কবি হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থতাই বয়ে আনে। পদ্মবনের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য পরিত্যাগ করে তিনি শ্যাওলা নিয়ে ক্রীড়ামত্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু মাতৃভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বপ্নাদেশে কবির চেতনা জাগ্রত করেন, অর্থাৎ কাব্যচর্চার প্রেরণা অনুভব করে তিনি বাংলাভাষায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই ভাষা কবির মাতৃভাষা—অজস্র মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ, অতএব পরভাষারদ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনার কোন যুক্তি নেই। কাব্যলক্ষীর আহ্বানে কবি সুখানুভবে ও আত্মমর্যাদায় ঋদ্ধ হয়ে মাতৃভাষায় খুঁজে পান অনন্ত রত্নসম্পদের আকর এবং বাংলা সাহিত্যকে নিজ প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. 'পর-ধন লোভে মত্ত' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন?

উত্তর : 'বঙ্গভাষা' কবিতার উদ্ধৃত বাক্যাংশে পরধন অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্য-উপাদানের কথা বলা হয়েছে। মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইংরেজি ভাষায় বড় কবি হবেন, তাঁর সাহিত্য সাধনার আরম্ভও হয় ইংরেজি ভাষাতেই।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ছিল বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণদের কাছে আরাধ্য। কলকাতার নব্যশিক্ষিত যুবকদের চিন্তাচেতনায় ইংরেজ সভ্যতা-সংস্কৃতির যে প্রবল প্রভাব পড়েছিল তাতে তৈরি হয়েছিল এক পরানুকারী অথচ আলোকিত যুবসমাজ, ইতিহাসে যারা ইয়ং বেঙ্গল নামে অভিহিত। মাতৃভাষার প্রতি এদের ছিল অবহেলা। কবি নিজেও ইংরেজি কবিতা রচনার ভ্রান্ত পথানুসারী হয়েছিলেন।

২. 'বঙ্গভাষা' কোন জাতীয় কবিতা?

উত্তর : 'বঙ্গভাষা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট জাতীয় কবিতা। কবি মধুসূদন এর প্রবর্তক। সনেট রচিত হয় চৌদ্দ পংক্তিতে, আট ও ছয় পংক্তির বিভাজনে ভাবনাবস্তুর প্রস্তাবনা ও সম্প্রসারণ ঘটে একটি সুনির্দিষ্ট রীতিতে। আট পংক্তিকে বলা হয় অষ্টক (Octave) এবং ছয় পংক্তির নাম ষষ্টক (Sestet)। সনেটে প্রধানত দুটি রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে— পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয়। বঙ্গভাষায় গৃহীত হয়েছে উভয় রীতির মিশ্রণ। প্রথম চার ও শেষ দুই পংক্তি শেক্সপীয়রীয় রীতিতে, পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণ পর্যন্ত অনিয়মিত শেক্সপীয়রীয় রীতিতে এবং নবম থেকেদ্বাদশ চরণ পর্যন্ত পেত্রার্কীয় গঠনে বিন্যস্ত হয়েছে। আলোচ্য কবিতার অষ্টকে বর্ণিত হয়েছে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করার মনোবেদনা, ষষ্টকে ব্যক্ত হয়েছে কাব্যপ্রেরণার সঠিক নির্দেশনা লাভ, স্বভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রেরণা ও সিদ্ধিলাভের প্রসঙ্গ।

৩. 'বঙ্গভাষা'র ছন্দ কি ?

উত্তর : 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। আপনারা নিশ্চয়ই ইউনিট- ১ এ কবিতার ছন্দ বিষয়ে পরিচিত হয়েছেন। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত— এই তিনটি ছন্দরূপের মধ্যে অক্ষরবৃত্ত প্রধান ছন্দ। গম্ভীর ভাব, ওজস্বী শব্দ ও ধীরলয় সম্বলিত এই ছন্দটির বিকাশ ও বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যজগতের বিশেষ সম্পদ। এখানে প্রতি চরণে ১৪ মাত্রার দুটি পর্ব রয়েছে, প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পর্বে ৬ মাত্রা। যেহেতু এটি সনেট, তাই এর অন্তমিল হল— কখ কখ, খক খক, গঘ ঘগ, ঙঙ।

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন ?

উত্তর : আলোচ্য চরণটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বঙ্গভাষা' নামক সনেট থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে কবি শৈবাল ও পদ্মকাননের সঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা ভাষাকে উপমায়িত করেছেন।

বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য ও শক্তি অবহেলা করে কবি ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল তিনি ঐ ভাষায় বড় কবি হবেন। কিন্তু এটা ছিল ব্যর্থ প্রয়াস, পরধনের প্রতি লোভ ভিক্ষাবৃত্তিতুল্য। কবির এই মানসিকতা ভ্রমাত্মক ও গ্লানিময়। যে নিজ মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে নিজের সৃষ্টিক্ষমতাকে অন্যভাষায় প্রকাশে নিয়োজিত থাকে, সে অবশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা নিজ ভাষা অজস্র সম্পদে পরিপূর্ণ, বিশেষত বাংলাভাষার ঐতিহ্য, শব্দসম্পদ ও ছন্দরীতি অনন্য। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও আত্মজ্ঞানের অভাববশত তিনি ইংরেজিকেই শ্রেয়জ্ঞান করেছিলেন; অথচ ইংরেজি ভাষা শৈবালের মত পুষ্পহীন, বিপরীতে বাংলাভাষায় সৃষ্ট কাব্যনিদর্শনসমূহ যেন পদ্মবনের শোভা। কবি এই শোভা বিস্মৃত হয়ে শ্যাওলা নিয়ে খেলা করেছেন।

কবির গভীর আত্মগ্লানি ও মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণা উক্ত কাব্যাংশে রূপায়িত হয়েছে। বক্তব্য উপস্থাপনে কবি প্রকৃতিজগতের শৈবাল ও পদ্মবনের প্রতিতুলনা ব্যবহার করেছেন।

২. মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

উত্তর : [সংকেত]

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যাটি নিজে প্রস্তুত করুন। এখানে বাংলা ভাষার কাব্যসম্পদের কথা বলা হয়েছে। পূর্ণ মণিজালে অর্থাৎ বিচিত্র কবিতাগানে বাংলা সাহিত্যখনি পরিপূর্ণ। মধুসূদনের পূর্ববর্তীকালে রচিত কাব্যসম্পদের প্রসঙ্গই এখানে উত্থাপিত; যেমন, কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. "বঙ্গভাষা" কবিতা কবি মধুসূদনের আত্ম আবিষ্কারের শিল্পভাষ্য — মন্তব্যটি আলোচনা করুন।

২. সনেট হিসেবে 'বঙ্গভাষা' কবিতার স্বরূপ ও সার্থকতা নিরূপণ করুন।

৩. 'বঙ্গভাষা' কবিতার ভাববস্তু ও শিল্পমূল্য বিবেচনা করুন।

১ নং রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে মাতৃভাষার মহিমান্বিত গৌরবের প্রতি কবির সুগভীর হৃদয়াবেগ। এতে ব্যক্ত হয়েছে কবির আত্মজীবনের ভ্রান্তি, কবিতা রচনার সঠিক দিকনির্দেশনার তথ্য এবং বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যমন্ডিত রূপের ভাবচিত্র।

আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনালগ্নে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতি ও ব্যক্তিমানুষের অন্তর্বেদনা প্রকাশে মনোযোগী ছিলেন। সনেট রূপকল্পের পেত্রার্কীয়-শেক্সপীয়রীয় রীতির সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি রচনা করেন আলোচ্য কবিতাটি। বহুভাষাবিদ মধুসূদনের প্রত্যাশা ছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করে যশস্বী হবেন। কিন্তু এই পন্থা ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যের সম্পদ হরণের মতই নীচকাজ, এতে প্রকৃত সুখ ও আত্মমর্যাদা থকে না। অন্য ভাষায় কাব্যচর্চার প্রয়াস হয়ে ওঠে কৃত্রিমতার নামান্তর, যা এক সময় কবিকে করে বিফলতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ এবং ব্যর্থ। কবি একে অভিহিত করেছেন পদ্মবনের পরিবর্তে শৈবাল নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকার অর্থহীন ক্রিয়া হিসেবে। উচ্চাভিলাষে মোহগ্রস্ত কবি আত্মগ্লানিতে পীড়িত হয়ে স্বভাষায় প্রত্যাবর্তন করেন ও নিজের সমগ্র জীবনধারার পরিবর্তন ঘটান। কবিতা রচনার অন্তর্প্রেরণাই তাঁকে এই সত্যের পথ দেখায়। মাতৃভাষার গর্ভেই রয়েছে তাঁর প্রতিভার যোগ্য ক্ষেত্র ও কবিতা সৃষ্টির উৎস-উপাদান। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ মাতৃভাষাতে প্রকাশক্ষম ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়, এই চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করে কবিচিত্ত হয়ে ওঠে নবজাগ্রত ও আবেগময়। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় বিধৃত হয়েছে এই আত্মস্বাক্ষরিত ও সচেতন অন্তর্লোকের উদ্ভাস। বাংলাভাষার ঐশ্বর্যের প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ ও শ্রদ্ধাবোধে কবিতাটি অনন্য। এখানে আরো উন্মোচিত হয়েছে ভিন্নভাষা ও সংস্কৃতিতে লিপ্ত থাকার ভ্রান্তি থেকে মুক্তির আনন্দ। কবিচিত্তে জেগেছে মাতৃভাষা-প্রীতি ও সচেতনতা, নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অন্তর্নিহিত আবেগ এবং সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে গভীর আত্মবিশ্বাস। একে বলা যায় অন্ধকার চিত্তগুহায় সূর্যালোকের স্পর্শলাভ এবং মাতৃভাষায় ঐতিহ্যরূপ বিশাল রত্নখনির আবিষ্কার। কবির এই আবিষ্কার ও প্রত্যাবর্তনই পরবর্তীকালে তাঁকে অভিষিক্ত করেছে বাংলা সাহিত্যের বরপুত্র হিসেবে। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি মধুসূদনের কবিসত্তার বন্ধনমোচন ও বিকাশের সংহত শিল্পভাষ্য। এতে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষা বিষয়ক অনুভূতির চিরায়ত প্রকাশ, পরবর্তীকালের আরও অনেক ভাষা বিষয়ক কবিতার মমতাঘন ও সংকল্প-শুদ্ধ রূপের পূর্বাভাস। আমাদের ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাপুত সংগ্রাম ও আবেগ-আর্তির যে মহত্তম ইতিহাস রয়েছে, কবিতাটি যেন তারই বীজাঙ্কুর।

পাঠ-২

বলাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি —

- কবিতার বিষয়ভাবনা সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন।
- কবিতাটির অলঙ্কার, শব্দভাষা ও ছন্দ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবিতাটিতে কিভাবে তত্ত্বদর্শন কাব্যমূল্য অর্জন করেছে, তা আলোচনা করতে পারবেন।

লেখক-পরিচিতি

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোতে, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), জননী সারদাদেবী। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্সদ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপন্নদ্বারকানাথ নিজের যোগ্যতা বলে সেকালের কলকাতায় ধনী শিল্পপতি ও সমাজের প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। উনিশ শতকের কলকাতায় ধর্ম-সাহিত্য-ব্যবসা-শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মকান্ডে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির অগ্রণী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ফলে শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ এক অভিজাত পরিএন্ডলের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তাঁকে প্রেরণ করা হলেও, শৈশব-কৈশোর থেকেই বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিলো না। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে প্রথম ইংল্যান্ড পাঠানো হয়। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নও করেন কিছুদিন। কিন্তু পিতৃ-আদেশে পাঠ-অসমাপ্ত রেখেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে ব্যারিস্টারী পড়ানোর জন্যে দ্বিতীয় বার লন্ডনে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু যাত্রারম্ভ করেও মধ্যপথে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে রবীন্দ্রনাথের সনাতন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। পুঁথিগত বিদ্যার বাঁধন তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনি কখনও।

শৈশবেই সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তি, সংবেদনশীলতা ও মননধর্মের প্রকাশ ঘটেছিলো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। আর মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি প্রকাশ করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ)। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'করুণা' (১২৮৪-৮৫ বঙ্গাব্দ)। পরিবর্তমান সময়স্রোতে রবীন্দ্র-মানস ক্রমবিকশিত হয়েছে প্রতিনিয়ত, দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ছোটগল্প, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি শাখায় তাঁর সৃজনশীলতা জন্ম দিয়েছে এক সমৃদ্ধ ভান্ডার। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলি তাঁর অসামান্য প্রতিভার সাক্ষ্যবহ।

একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ কীর্তিমান। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়'। উত্তরকালে এই বিদ্যালয়ই 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। তাঁর সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠসময় অতিবাহিত হয় বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং সাজাদপুর অঞ্চলে। পারিবারিক জমিদারির তত্ত্বাবধান-সূত্রে পূর্ববাংলার পদ্মাবিধৌত এই অঞ্চলে তাঁকে প্রেরণ করা হয়। এ সময় কৃষি উন্নয়ন ও কৃষক-কল্যাণের জন্যও রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ 'Songs Offerings' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের জন্যই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। ব্রিটিশ সরকার 'নাইট' উপাধি তাঁকে প্রদান করেন।

দলীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব রক্ষা না করলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবন ও রাজনীতি সতর্ক মানুষ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রকাশ্য গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তিনি সামনে এসে দাঁড়ান। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রচিত 'সভ্যতার সংকট'

(১৯৪১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতাগর্বী অথচ যুদ্ধোন্মাদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে একদিন এ-দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে— রবীন্দ্রনাথ এ-আশাবাদ প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।

কবি অভিধা-ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশধারায় তাঁর অসামান্য অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর সৃজনসামর্থ্যেই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম আত্মপ্রকাশ। সুদীর্ঘ সাহিত্যিকজীবনে 'সে' এবং লিপিকা'র রচনাগুলি ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন চুরানব্বইটি ছোটগল্প। 'ভিখারিণী' থেকে 'মুসলমানীর গল্প' (মুখে মুখে রচিত গল্পের খসড়া) পর্যন্ত এই বিশাল গল্পভান্ডার বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশাধারার শিল্পিত ইতিহাস। বাংলা সৃষ্টিশীল গদ্যের গতিপ্রবাহও চিহ্নিত হয়ে আছে অখন্ড 'গল্পগুচ্ছে'র পাতায় পাতায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন — 'আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্রমূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পারো না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে।.... মোপাসাঁর মতো যেসব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বলো, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাদের কী দশা হত জানি নে।'

সত্তরতম জন্মদিনের সম্বর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে। সে আর কিছু নয়, আমি কবিমাত্র'। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল-পরিবেশে শৈশবেই তাঁর কবি-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' (১৮৭৬)। এরপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমাগত বাংলা কবিতাকে ঋদ্ধ করে গেছেন। তাঁর প্রতিটি কাব্যই স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট তারিখে (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জীবনাবসান হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর উলেখযোগ্য রচনা

কবিতা: মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৩), চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১১), বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ (১৯৩২), জন্মদিনে (১৯৪১), আরোগ্য (১৯৪১), শেষ লেখা (১৯৪১)।

উপন্যাস: রাজর্ষি (১৮৮৯), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯)।

গদ্য রচনা: য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (১৮৯১), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), জীবনস্মৃতি (১৯১২) ছিন্নপত্র (১৯১২),

প্রবন্ধ: কালান্তর (১৯৩৭), বিশ্ব পরিচয় (১৯৩৭)।

নাটক: বিসর্জন (১৮৯০), অচলায়তন (১৯১১), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬)।

গান: গীতিবিতান।

ছোটগল্প: গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড-১৯২৬, ২য় খন্ড-১৯২৬, ৩য় খন্ড-১৯২৭), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১), গল্পসল্প (১৯৪১)।

পাঠ-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বলাকা' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা'র (১৯২৬) অন্তর্গত ৩৬ সংখ্যক কবিতা। ১৩২২ বঙ্গাব্দে কাশশ্মীরের শ্রীনগরে অবস্থানকালে তিনি কবিতাটি রচনা করেন। কখনো-কখনো প্রকৃতির দৃশ্যাভিজ্ঞতা থেকে কবিচিত্তে জেগে ওঠে আকস্মিক কাব্যপ্রেরণা ও জীবনদর্শন। 'বলাকা' তেমনি প্রাকতিক দৃশ্যানুভূতিজাত আকস্মিক প্রেরণালব্ধ কবিতা। শ্রীনগরের ঝিলম নদীতে বোটে অবস্থান করার সময় তিনি আসন্ন সন্ধ্যার পটে দেখেছিলেন এক ঝাঁক বুনোহাঁসের উড়ে-চলার দৃশ্য। তাদের পাখার শব্দধ্বনি কবির দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরে বিশ্বের চাঞ্চল্য ও গতিশীলতার প্রতিচ্ছবি। এই প্রতিচ্ছবিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন গতিদর্শনের শিল্পমূর্তি। 'বলাকা' প্রথম প্রকাশিত হয় সবুজপত্র পত্রিকায়, কার্তিক ১৩২২ বঙ্গাব্দে।

মূলপাঠ

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার!
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার-তরু সারে সারে ;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি —
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি ॥
সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সররমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন ॥
মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে
পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগি!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে —
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!'
হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে

শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি —
এই গিরিরাজি
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে ॥
শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

শ্রীনগর। কার্তিক ১৩২২

◆ ◆

বস্তুসংক্ষেপ

ঝিলম নদীর ঝিলিমিলি বঙ্কিমস্রোত যেন বাঁকা তলোয়ার। সন্ধ্যার অন্ধকার এসে যেন বাঁকা তলোয়ারটিকে খাপের মধ্যে পুরে নিল। জোয়ার-ভাঁটার পরম্পরার মতো দিনের আলোর শেষে এল রাতের এই কালো আঁধার-বন্যা। নদীর জলে প্রতিবিম্বিত তারাজ্বলা আকাশের ছবি যেন বন্যায় ভেসে-আসা তারাফুল। কবি নদীর চঞ্চল স্রোতে অচঞ্চল আকাশের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। নদীতীরের পথপারে পাহাড়ের পাদমূলে রয়েছে সারিবদ্ধ দেবদারু বৃক্ষ। তারা ঘনবদ্ধ হয়ে রচনা করে রেখেছে অন্ধকারের স্তব্ধরূপ। আমাদের সুপ্ত চেতনা যেমন অন্ধকার রাত্রে অস্পষ্ট আলোর স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তেমনি এখানে জমাটবদ্ধ দেবদারুর মধ্যেও ব্যক্ত হতে চাইছে কোন অস্পষ্ট স্বপ্নকথা। কিন্তু প্রকাশে ব্যর্থ হয়ে তারা সে কথাকে পুঞ্জীভূত কান্নায় রূপান্তরিত করে রাখে, সেই কান্নাই হলো অন্ধকার।

এই স্তব্ধ মুহূর্তে হঠাৎ শোনা গেল এক ঝাঁক হংসের পক্ষধ্বনি। কবির মাথার উপর দিয়ে তারা শব্দের বিদ্যুৎছটা বিকীর্ণ করে দিয়ে দূরদেশে উড়ে গেল। তাদের পাখার মদমত্ত অট্টহাস যেন আকাশে সৃষ্টি করল শব্দঝড়। সুপ্ত আকাশ-নদীতে সেই শব্দতরঙ্গ জাগিয়ে তুলল বিস্ময়ের প্রতিধ্বনি। ফলে নদী ও আকাশ একই সঙ্গে হয়ে উঠল গতিচঞ্চল— চলমানতার সঙ্গে যুক্ত হলো স্তব্ধতা। স্বর্গের অপ্সরা পৃথিবীর ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করতো। তাদের রূপ যেমন শব্দধ্বনি হয়ে সন্ন্যাসীর স্তব্ধতা ভেঙে দিত, তেমনি স্তব্ধবাক আকাশের মৌনতা ভেঙে দিল বলাকার পক্ষধ্বনি। এই শব্দে শিহরিত হলো পর্বতশ্রেণী, রোমাঞ্চিত হলো দেবদারু। তাদের জড়প্রাণে সঞ্চারিত হলো চলার আবেগ। হংসপাখার বিমানগতি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুললো গতির আকাঙ্ক্ষা।

এই ধ্বনি স্পর্শে স্থানু পর্বত মেঘের মতো উড়ে চলার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হলো। শিকড়বদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীও মাটির বন্ধন ছিন্ন করে ঐ শব্দধ্বনির পথ অনুসরণ করতে চাইলো। কারণ তারাও হতে চায় নিরুদ্দেশের যাত্রী। যাযাবর পাখিদের পাখায় রয়েছে অস্থিরতার চাঞ্চল্য, শুধুই উড়ে-চলার আকুলতা। পরিচিত বাসায় তারা চিরকাল বাস করতে চায় না। এক বাসা

ভেঙে সমুদ্রপারের অন্য বাসার সন্ধানে তারা উড়ে যায়। কবি এ-অর্থে বলাকাকে বলছেন 'পাখা বিবাগী'। তারা নিখিল-বিশ্বপ্রাণে সেই সুর বাজিয়ে দিয়ে গেল যে স্থিতি নয়, অন্য কোথাও ধাবিত হওয়ার আবেগই সৃষ্টির প্রকৃত ধর্ম।

কবির অন্তর্চক্ষুতে উদ্ভাসিত হলো সৃষ্টিলোকের গভীর সত্য, যা-কিছু স্তব্ধ হয়ে ছিল তার আবরণ যেন উন্মোচিত হয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন সর্বত্র রয়েছে গতির চাঞ্চল্য, নিশ্চল বস্তুর অন্তরে রয়েছে গতিশীলতার উদ্দীপনা ও বেগ। এই অনুভব থেকে কবি আরও দেখলেন যে তৃণদল মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে; মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বীজ মেলছে অঙ্কুর-পাখা। ক্ষুদ্র বস্তুর এই নিভৃত-চলার সত্য থেকে কবির দৃষ্টিবিন্দু ক্রমে আবিষ্কার করতে থাকে বৃহৎ চলমানতার রূপ। পর্বত, বন, বৃক্ষরাজি, নক্ষত্র— সবকিছুই সম্মুখ দিকে ধাবমান; সমস্ত বিশ্বজগৎ গতিস্পন্দনে ব্যাকুল ও সচল। তবে এই চলায় যেমন আছে আনন্দ, তেমনি আছে ক্রন্দনসুর। কবি তাই বলছেন, চলমান নক্ষত্র তার পাখার স্পন্দনে আলোর কান্না সৃষ্টি করে চমকে দিচ্ছে অন্ধকারকে। সৃষ্টিজগতের স্বরূপেই রয়েছে প্রসারণ-গতি— আলোর আকাঙ্ক্ষায় এই চলা সর্বদাই স্থিতিশীল নীড়-পরিত্যাগী, তাই বেদনাপুত। প্রকৃতির মতো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন যুগ থেকে যুগান্তরে ধাবিত হচ্ছে। চেতনার উন্মেষকাল থেকে — কোন এক অস্পষ্ট অতীতে মানবচিত্তে জন্মেছিল এইসব আকাঙ্ক্ষা-কামনাভাবনার বাণী। চিত্তগুহা ছেড়ে ঐসব বাণী স্রোতের মতো ভেসে চলেছে মহাকাল সমুদ্রে; কোথায় তাদের গন্তব্য তা জানা নেই। অতীত থেকে উৎসারিত এই অপূর্ণ-অচরিতার্থ বাণী পূর্ণতা-সন্ধানী, তাই চলমান। কবি নিজের অন্তরের দিকেও তাকিয়ে দেখলেন যে তার মনটিও বাসা-ছাড়া পাখির মতো অবিরত চলিষ্ণু। যা-কিছু গতিশীল ও সম্মুখগামী তাদের সহযাত্রী হয়ে কবির মন চলছে। অর্থাৎ সৃষ্টিলোক, মানবচিত্তের বাণী আর কবির হৃদয়— সবকিছু একসূত্রে একটি গতির সুরে বাঁধা। কিন্তু কোথায় গন্তব্য তা জানা নেই। কবি শুধু এটুকু জানেন যে এই বাসস্থান ছেড়ে, স্থিতির মায়া ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। বলাকা যেমন সংসার-নীড় ছেড়ে কিসের আবেগে অকূলে পাড়ি দেয়, অনিশ্চয়তায় উড়ে চলে, তেমনি নদী-বন-পাহাড়-নক্ষত্র-মানুষ-কবিমন— সবকিছুর মধ্যে আছে ঐ সম্মুখ গতির দুর্জ্ঞেয় আবেগ। এই আবেগ-রূপটিই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্ব, উপনিষদে একে বলা হয়েছে চরৈবেতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক-প্রশ্ন

১. হংসবলাকার উড়ে যাওয়ার কবিচিত্তে কী প্রভাব ফেলেছিল?
২. 'পাখা বিবাগি' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
৩. বলাকার পক্ষধ্বনি প্রকৃতিকে কীভাবে আলোড়িত করল?

১ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তর:
'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বলাকা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গতি সম্পর্কিত দর্শনের শৈল্পিক প্রকাশ। কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঝিলম নদীর বোটে অবস্থান করার সময় আসন্ন সন্ধ্যার পটে কবি অবলোকন করলেন এক ঝাঁক হাঁসের উড়ে-চলার দৃশ্য। এ দৃশ্য কবির হৃদয়কে উপনীত করে এক গভীর দর্শনের প্রান্তে। বলাকা উড়ে চলে যাবার পর তিনি অনুভব করলেন সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এক ধরনের আবেগের সূত্রপাত করেছে।এ আবেগ চলার আবেগ। স্তব্ধ প্রকৃতি তার স্থির অবস্থানের বন্ধন ছিন্ন করে উড়ে চলে যেতে চায় সুদূরের পানে। এ থেকে কবি অনুভব করলেন পৃথিবীর সমস্ত বস্তু'র মধ্যে এক ধরনের গতিশীলতা বিরাজমান।

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন
১. মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি, —
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

উত্তর: উদ্ধৃত পংক্তিসমূহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বলাকা' কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে কবি সৃষ্টিজগতের মৌনতার অন্তরালে অব্যক্ত ধ্বনিময় ক্রন্দনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

সন্ধ্যারাগে অনুরঞ্জিত ঝিলমের বঙ্কিম স্রোতরাশি রাত্রির আগমনে অন্ধকারে আবৃত হতে যাচ্ছে। আকাশের নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে ক্রমে নদীর জলে যেন রাত্রির জোয়ার জাগল। স্তব্ধ পর্বত পাদদেশে দেবদারু বৃক্ষের সারি, অন্ধকারে ঢেকে গেল। সৃষ্টির প্রচ্ছদে রাত্রির এই অন্ধকার যেন না-বলা-কথার, অস্ফুট ধ্বনিপুঞ্জের মিলিত ক্রন্দন। অন্ধকার রাত্রির প্রহরে সৃষ্টি তার ভাষা খুঁজে ফেরে স্বপ্নজগতে। কিন্তু অস্পষ্টতা ও স্তব্ধতার জন্য তার কণ্ঠে শব্দ উচ্চারিত হয় না। প্রকৃতির পটে সৃষ্টিজগতের বেদনাবিহ্বল ধ্বনিহীন নির্বাক রূপটি এখানে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হয়েছে। কবি ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন চিত্রকল্প তথা ইমেজ।

বিশ্বজগতের ভাষাহীন অন্তরের বেদনাঘন-স্বরূপ কবির অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। মানবহৃদয়ের প্রকাশিত বাণীর মতই যেন সৃষ্টি নিজেকে ব্যক্ত করতে না পারার অক্ষমতায় অসহায়।

২. **মনে হল, এ পাখার বাণী**
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

উত্তর: পংক্তি চতুষ্টয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বলাকা' কবিতার অন্তর্গত। কবি এখানে বলাকার পক্ষধ্বনিতে স্তব্ধতার জাগরণকে তুলে ধরেছেন।

ঝিলম নদীর প্রতিবেশে কবি আসন্ন রাত্রির অন্ধকার প্রতিচ্ছায়ায় বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করছিলেন। অকস্মাৎ এক ঝাঁক হংসদূত শব্দঝংকারে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে আকাশে উড়ে গেল। ধ্বনিহীন, নির্বাক বৃক্ষ-নদী-পর্বত বলাকার পাখার শব্দে শিহরিত হল। এ দৃশ্যানুভূতিতে কবির অন্তরজগতে উন্মোচিত হল একটি গভীর দর্শনভাবনা। বিশ্বজগতের নিশ্চল ও শব্দহীন অস্তিত্বের মধ্যে হংসপক্ষধ্বনি এক মুহূর্তের জন্য যেন চলার আবেগ জাগিয়ে দিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ সর্বাস্তিবাদী অর্থাৎ সবকিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, আবার কবিকল্পনায় অনুভব করেন বস্তুর রূপ ও স্বরূপ — দুটোকেই। রূপে যে বস্তু অচল ও নিঃশব্দ, স্বরূপে সেই বস্তুই চাঞ্চল্যে গতিশীল। অর্থাৎ বিশ্বজগৎ অখ গতিমানতায় আবর্তিত ও সম্মুখে প্রসারিত।

এই গতিপ্রবাহের প্রত্যক্ষ দৃশ্যের অন্তরালে অদৃশ্য চলার উন্মুখ আবেগই এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩. **শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে**
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
— অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

উত্তর: উদ্ধৃত কাব্যাংশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বলাকা' কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি মানুষের চলার গতিপ্রবাহ সম্পর্কে ব্যঞ্জনাময় উক্তি করছেন।

সন্ধ্যা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে এক ঝাঁক হংসপাখির আকস্মিক শব্দঝংকারে কবিচিত্তে উন্মোচিত হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির চলার ধর্ম সম্পর্কিত বোধি। সচল ও অচল উভয় বস্তুতে তিনি প্রত্যক্ষ করেন অন্তবিহীন চলমানতা, সুদূর অতীত উৎস থেকে অনাগত ও অস্ফুট ভবিষ্যতের দিকে সবকিছুই নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে। মানুষ সৃষ্টির চৈতন্যবান প্রাণী, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, শ্রম-কর্ম ও বাণী রয়েছে। মানুষ সর্বদাই স্বপ্ন ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে চায়। এই অসংখ্য স্বপ্নাদর্শ বাণীরূপ ধারণ করে অতীত থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, বর্তমান পার হয়ে তারা চলছে অপরিস্ফুট সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। চলার ধর্মই জীবন ধর্ম, চৈতন্যেরও লক্ষ্য এই চলার মধ্য দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছানো; কিন্তু সেই পূর্ণতার স্বরূপ সে জানেনা, তাই কবি একে অস্ফুট বলছেন। তবে মানুষ তার সুন্দর, শুভ ও কল্যাণময় সত্তার দিকেই ছুটে চলছে।

মানুষের এই যাত্রাপথটিকে কবি দেখতে পাচ্ছেন, এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই পথিক মানুষের কথা বলেন— চলাই যার আনন্দ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'বলাকা' কবিতার গতিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. 'বলাকা' কবিতার শিল্পরূপ ও কাব্যরস সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. বলাকার উড়ে-চলা ও মানবজীবনের চলার মধ্যে কবি কোন ঐক্য দেখতে পেয়েছেন?

১ নং প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ মননশীল চৈতন্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতায়। বিজ্ঞানতত্ত্ব, সমাজব্যাখ্যা, মহাজাগতিক রূপ, অধ্যাত্মবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর রসস্নিগ্ধ মন গভীরভাবে ভাবুক ও দার্শনিক। 'বলাকা' কবিতাটিতে আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণুবাদ ও গতিবাদ অভিনব কাব্যরূপ পেয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় জীবনদর্শনের নির্যাস। কবির জীবন-অভিজ্ঞতায় পাশ্চাত্য ভ্রমণের তাৎপর্য কবিতাটিতে প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছে। মানবজীবন প্রবাহের প্রবল ধারাটিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইউরোপ-আমেরিকার কর্মজগতে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আবেগ-মূল্যও এখানে প্রেরণারূপে সক্রিয় ছিল। কবি সর্বতোভাবে বিশ্বমানবের ঐক্যস্রোতকে অনুধাবন করেছিলেন। আর সেসঙ্গে তার চেতনায় বিপরীত প্রত্যাঘাত হিসেবে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মরণ-বিভীষিকা।

শ্রীনগরের ঝিলম নদীতে বোটে অবস্থানকালীন একটি সান্ধ্য-মুহূর্তে হংসবলাকার পক্ষধ্বনি কবিতাটির জন্মসূত্র। ক্ষণস্থায়ী বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কবির অন্তর্জগতে জেগে ওঠে আলো এবং সেই আলোতে বিশ্বের গতি-স্বরূপটি দর্শন করেন তিনি। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্ব থেকেই চলার সুরের সাধক। চলার কথা, গতির কথা বহুভাবে তিনি প্রকাশ করে এসেছেন। আলোচ্য কবিতায় অনেক আলোচক ফরাসি দার্শনিক বের্গসঁর Creative Evolution গ্রন্থে উপস্থাপিত গতিতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন। বের্গসঁর মতে, মানুষ প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশ-ধারার সর্বোচ্চ স্তরের জীব, তার প্রাণবেগ-শক্তি রয়েছে এবং সে সর্বদা অবিরাম সংঘাতের মধ্য দিয়ে চলছে। অবিরাম একটি গতি জড় ও চেতনকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হচ্ছে, কিন্তু এই গতি প্রতিমুহূর্তে বাধার সম্মুখীন হয়। গতির সঙ্গেই রয়েছে পশ্চাদগতি অর্থাৎ বাধা, এই বাধাই বস্তুরূপে আকার লাভ করে থাকে। মানুষ চেতনাসম্পন্ন বলে সে বাধাকে অতিক্রম করে গতিশীল থাকতে চায়, এটাই তার স্বভাব। তবে বের্গসঁর তত্ত্বে এই গতির কোন পরিণাম নেই, মানুষের চলারও কোন অন্তিম গন্তব্য নেই।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদস্নারা আবাল্য প্রভাবান্বিত, সেখানেও বিশ্বসৃষ্টিকে পরম সত্তার প্রকাশরূপ বলা হয়েছে, চলার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, চলাই প্রাণের ধর্ম। কিন্তু তা উদ্দেশ্যহীন, অন্ধ নিয়মে বদ্ধ নয়। বস্তুজগতের এই চলার লক্ষ্য হচ্ছে পরম সত্তার পূর্ণস্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোমান্টিক কল্পণামনীষা দিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন বিশ্বের মধ্যে একক প্রাণশক্তির লীলা। এই প্রাণশক্তি চলার আবেগে সম্মুখে ধাবিত, সেই সম্মুখে রয়েছে এক পরম ব্রক্ষের সঙ্গে ঐকাত্মতা লাভের কামনা।

কবিতাটির শুরুতে নদীর জলস্রোত, স্তব্ধ গিরিতট ও দেবদারু বৃক্ষের মধ্যে কবি চলমান গতি ও অচল গতি — দুটোকেই উপস্থাপন করেছেন। এ কবিতার কাব্যরস ঘনীভূত হয়েছে এই অচলতার মধ্যে গতির সন্ধান-কল্পনায়, কেননা তত্ত্বটির মূল কথাই হল জড় ও চেতন— উভয়ে একটি গতির অন্তর্গত প্রবাহ। তাই বীজের মধ্যে গতির তরঙ্গ, পর্বতের অন্তরে মেঘের মত উড়ে বেড়াবার আকাঙ্ক্ষা লালিত। এই নিঃশব্দ গতির প্রসঙ্গটি বৈজ্ঞানিকভাবেও সত্য, বস্তুজগৎ অণুপরমাণু-চক্রে অবিরত আবর্তিত হচ্ছে। সর্বাস্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ জড়বস্তুতেও তাই চলার আবেগকে অনুভব করেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁর গতিভাবনায় রয়েছে মানব জীবনপ্রবাহের প্রসঙ্গ। সুদূর অতীত থেকে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-চেষ্টা নিয়ে এক পরম রূপের অভিযাত্রী, সে সর্বদা রূপান্তরের মধ্যে আপনার সত্তাকে বিকশিত করছে। তাই তার যাত্রা কখনও স্থগিত হয় না, মানবজীবনধারার মধ্যে এই যাত্রা অবিশ্রান্তভাবে চলমান। এক অর্থে সভ্যতার যাত্রী মানুষ তার সুন্দর-শুভ-কল্যাণের বিচিত্র পথ পরিক্রমায় যুগ থেকে যুগান্তরে ধাবিত।

তৃতীয়ত, সম্মিলিত মানবজীবনের চলার পাশে কবি আবিষ্কার করেন নিজের ব্যক্তিমনের চলার গতিকে। মানুষের মন চঞ্চল, নীড়বাসী হয়েও সবসময় নীড় পরিত্যাগ করে আকাশে উড়তে চায়। জৈবরূপের বন্ধন ছেড়ে সে হতে চায় মুক্তির পাখি। কবির মন বিশ্বপ্রাণরূপের অংশ বলেই বিশ্বগতির নিয়মবশত চলার আবেগে অস্থির ও উন্মুখ। মানুষ যা কিছু সৃষ্টি বা অর্জন করে তার মধ্যে আবদ্ধ ও সমাপ্ত হয়ে থাকে না, অর্জিত হওয়া মাত্র সেটি পরিত্যাগ করে সে নতুন সৃষ্টি-স্বপ্নে উদ্বেলিত ও সক্রিয় হয়। এর ফলে সৃষ্টির প্রবাহ অক্ষুণ্ন থাকে এবং একটি পূর্ণতর রূপ অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ সবসময় নিবেদিত থাকে।

উক্ত তিনটি গতিরূপের সূত্রে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এর প্রাসঙ্গিকতা কী ! রবীন্দ্রজীবনে ও কবিতায় এই চলার তত্ত্বটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে আলোড়িত কবিচিত্ত স্বদেশ, মানবজাতি ও ব্যক্তি-আত্মার চলার পথে

জড়তা, জীর্ণতা ও স্থবিরতা থেকে যেমন চেয়েছে মুক্তি, তেমনি স্থিতি ভেঙে আহ্বান জানিয়েছে নিত্য নতুনের আবির্ভাবকে। নতুনের অন্বেষাই ব্যক্তিকে রূপ থেকে রূপান্তরে নিয়ে যায়, প্রতিমুহূর্তে হয়ে ওঠার জন্য প্রেরণা দেয়। রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ বিজ্ঞান-দর্শন সূত্রবদ্ধ হয়েও তা একান্তই কবিমনীষার স্বকীয় ভাবনা। এ বিষয়ে বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন ক্ষুদিরাম দাসের রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়, নীহাররঞ্জন রায়ের রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা ইত্যাদি গ্রন্থ।

২ নং প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

'বলাকা' কবির নিবিড় উপলব্ধির শিল্পরূপ, বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের তত্ত্ব কবিচিত্তের রসায়নে একীভূত হয়েছে। বিস্ময়জাত আনন্দরস কবিতাটির প্রধান অবলম্বন। আবেগের অতিউচ্ছ্বাসকে সংযত করেছে চিত্রকল্প, গতির অবাধ প্রকাশকে সংহতরূপে বদ্ধ করেছে মুক্তক সমিলরীতির ছন্দ। আকস্মিক আলোক-উদ্ভাসে জাগ্রত কবিচিত্ত ও তাঁর আত্মভাষণ যেমন গীতিকবিতার মহিমা লাভ করেছে, তেমনি জীবনদর্শনের বিষয় হিসেবে নৈর্ব্যক্তিকতাও পেয়েছে। কবির আত্মধর্ম প্রকাশ পেলে কবিতা গীতিকাব্যিক হয়, আর নিজেকে আড়ালে রেখে সার্বজনীন অথবা ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিষয়, দৃষ্টি ও ভাবের প্রকাশ ঘটলে নৈর্ব্যক্তিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। 'বলাকা'য় দুটি বৈশিষ্ট্যই সমন্বিত হয়েছে। আবার কোন তত্ত্বও যে কবিতা হতে পারে তারও নিদর্শন এই কবিতাটি।

তত্ত্ব ও আবেগে 'বলাকা'র প্রকাশরূপ স্বতঃস্ফূর্ত। আকাশ, মৃত্তিকা এমনকি কবির মনোজগৎ পর্যন্ত কল্পনা প্রবেশ করেছে, সবকিছুই আবার একটি অনুভবের আলোকে আবদ্ধ হয়েছে, সেটি হল গতিপ্রবাহ। অনুভবজগৎ, ইন্দ্রিয়বোধ এবং বিশ্বপ্রকৃতির একীভূত রূপটিই 'বলাকা'র কল্পনাকে করেছে শিল্পিত।

স্থবির নিসর্গকে এখানে দৃশ্যচিত্রের মধ্যে চলমান-রূপে আঁকা হয়েছে। নিসর্গচিত্র, ইন্দ্রিয়ের প্রবল ব্যবহার এবং আত্মরূপ নির্মাণে কবি উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। নিসর্গচিত্রঃ 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা/আঁধারে মলিন হল— যেন খাপে-ঢাকা/বাঁকা তলোয়ার', অথবা 'তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি/ মাটির বন্ধন ফেলি/ ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা' ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টি ও শ্রুতির প্রবল ব্যবহার ঘটেছে, যেমনঃ 'শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে, 'বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে' ইত্যাদি। আত্মরূপ চিত্রঃ 'আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা, 'শুনিলাম আপন অন্তরে/অসংখ্য পাখির সঙ্গে/দিনেরাতে/ওই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে' ইত্যাদি।

কবিতাটিতে আট মাত্রার পর্বই বেশি ব্যবহৃত, চার মাত্রার প্রয়োগ বিস্ময় সৃষ্টির সহায়ক। 'বলাকা' কবিতা গতিবাদের শিল্পরূপ হিসেবে অনন্য।

৩ নং প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ [সংকেত]

এ-প্রসঙ্গে আপনারা নিজের বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করুন রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত ভাষ্যঃ

"বলাকা নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে— এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন-সিন্ধুতীরে আর এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।" [দ্র. রবীন্দ্র রচনাবলী,দ্বাদশ খন্ড]।

পাঠ-৩

বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

কাজী নজরুল ইসলাম
(১৮৯৯-১৯৭৬)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- এই পাঠে আপনি বাংলা সাহিত্যের একটি গীতিকবিতা সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত নজরুলের হৃদয়বেদনার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাবেন ।
- প্রকৃতির সঙ্গে স্মৃতির নিবিড় সংযোগ সম্পর্কে আপনার কাব্যবোধ জাগ্রত হবে।

লেখক-পরিচিতি

আবহমান বাংলা কবিতার ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম অনন্য কবিব্যক্তিত্ব। একদিকে তিনি রোমান্টিক কাব্যকল্পনায় আবেগময় ও বিরহী, অন্যদিকে সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকা অবলম্বনে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী শিল্পী। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমাস্থিত চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজী ফকির আহমেদ, মাতা জাবেদা খাতুন। গ্রামের মক্তবে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষা পাস করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। কিশোর বয়সে লেটো নাচ, গান ও যাত্রার দলে যোগদান ও আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বিদ্যালয় ত্যাগ করে নজরুল বাড়ি থেকে পালিয়ে আসানখ্রিস্টাব্দের রুটির দোকানে চাকরি নেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার কাজীরশিমলা গ্রামের নিকটে অবস্থিত দরিরামপুর বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হয়ে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের সৈন্যবাহিনীর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন ও হাবিলদার পদে উন্নীত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পূর্ণ উদ্যমে সাহিত্যরচনা, সাংবাদিকতা ও সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) প্রাক্কালে নজরুল কবিতা, প্রবন্ধ, গান ও সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদনা কালে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে বিবিধ রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। 'ধূমকেতু'র ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হলে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে নজরুলের রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ আরও প্রবলরূপ ধারণ করে। ১৯৪২-এর অক্টোবরে তিনি মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন ও তাঁর বাকশক্তি লোপ পায়। ১৯৭২-এর ২৪ মে তৎকালীন সরকার তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন, তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট নজরুল মৃত্যুবরণ করেন।

নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য বিখ্যাত হলেও হৃদয়াবেগ ও বেদনার প্রকাশক্ষেত্রেও অনন্য। রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রম করে তিনি একটি স্বকীয় কাব্যধারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ: **অগ্নিবীণা** (১৯২২), **বিষের বাঁশি** (১৯২৪), **ভাঙার গান** (১৯২৪), **সাম্যবাদী** (১৯২৫), **সর্বহারা** (১৯২৬), **ফণি-মনসা** (১৯২৭), **জিঞ্জির** (১৯২৮), **সন্ধ্যা** (১৯২৯) ও **প্রলয়শিখা** (১৯৩০)। তাঁর কবিতার মূল বিষয় হচ্ছে পৌরুষদৃপ্ত সংগ্রাম, গণচেতনা ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আকা ক্ষা, স্বাজাত্যবোধ, মানবতা ও সাম্যবাদ। কোমল মধুর মানবিক প্রেমের নিদর্শন রয়েছে **দোলনচাঁপা** (১৯২৩), **ছায়ানট** (১৯২৪), **পুবের হাওয়া** (১৯২৫), **সিন্ধু-হিন্দোল** (১৯২৭) ও **চক্রবাক** (১৯২৯) কাব্যে। এছাড়াও তিনি রচনা করেন জীবনীমূলক কাব্য **চিত্তনামা** (১৯২৬) ও **মরু-ভাস্কর** (১৯৫১-এ প্রকাশিত)। ছোটদের কবিতা-গ্রন্থ **ঝিঙেফুল** (১৯২৬) ও **সাত ভাই চম্পা**। গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে রচিত উপন্যাস হচ্ছে **বাঁধনহারা** (১৯২৭), **মৃত্যুক্ষুধা** (১৯৩০) ও **কুহেলিকা** (১৯৩১)। **গল্পগ্রন্থ: ব্যথার দান** (১৯২২), **রিক্তের বেদন** (১৯২৫), **শিউলিমালা** (১৯৩১), **নাটক: ঝিলিমিলি** (১৯৩০), **আলেয়া** (১৯৩১) ও **মধুমালা** (১৯৫৯)। **প্রবন্ধপুস্তক: যুগবাণী** (১৯২২), **রাজবন্দীর জবানবন্দী** (১৯২৩), **দুর্দিনের যাত্রী** (১৯২৬) ও **রুদ্রমঙ্গল** (১৯২৭)। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রচনা করেন দেশাত্মবোধক গান, কোরাস, প্রেমগীতি, শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামি সঙ্গীত, পল্লীগীতি ও হাসির গান। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয়-শিখা, যুগবাণী ও চন্দ্রবিন্দু। কবিকে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক (১৯৪৫), ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি (১৯৬০), রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৭৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৭৪) ও বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত একুশের পদক (১৯৭৬) প্রদান করা হয়।

পাঠ-পরিচিত

'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি' কবিতাটি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে অবস্থানকালে রচিত হয়। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'কালি-কলম' পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষের সংখ্যায় — চৈত্র, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে। পরে 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে ও 'সঞ্চিতা' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

কবিজীবনের কয়েকটি স্মরণীয় অধ্যায় এই কবিতাটির জন্মলাভে ক্রিয়াশীল ছিল। চট্টগ্রামে হাবীবুল্লাহ বাহার ও সামসুন্নাহার-দের বাড়িতে অবস্থানকালে একটি বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিকে মুগ্ধ করেছিল। কবি যে ঘরে থাকতেন তার জানালার পাশে পুকুর পাড়ে ছিল নয়টি সুপারি গাছ। গাছগুলির সঙ্গে কবির নীরব সখ্য গড়ে ওঠে। চন্দ্রালোকিত রাত্রি ও পুকুরের জলে প্রতিবিম্বিত সুপারিগাছের পাতার কম্পনদৃশ্য ছিল কবির ভাললাগার উৎস। এই গাছগুলি ছেড়ে আসার বেদনাই কবিতাটির অবলম্বন-ভাব। আসন্ন বিদায়ের পটে সঞ্চারিত বিষণ্ণতা কবিতায় সুরসম্মোহ সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতিপ্রেম ও হৃদয়াবেগের প্রকাশই এর মুখ্য আশ্রয়।

মূলমাঠ

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা, পান্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি!
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।...

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি"!
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায়, তন্দ্রায় ঢুলুঢুল্,
ফিরে ফিরে চায়, দুহাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল। —

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস-লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

তোমাদের আর আমার আঁখির পলব-কম্পনে
সারা রাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে! —
জাগিয়া একাকী জ্বালা ক'রে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়ার! — তোমার শাখার পলবমর্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।

তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-রেখা;
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্‌ঝির্‌ মির্‌ মির্‌ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলোনো তারির শাড়ির আঁচল খানি।
— তোমার পাখার হাওয়া

তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া!
ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি, — তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।

হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত — লইতে পরশখানি,
বাতায়নে ঠেকি' ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি'।
বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন।
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, "কর বিদায়ের আয়োজন!"
— আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে!
মর্ম্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন?
জানি — মুখে মুখে হবে না মোদের কোনদিন জানাজানি,
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপানি!

হয়ত তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই ক'রে,
ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে?
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোম্‌তাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-মল,
— বলো তাহে কার ক্ষতি?
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী! ...
হয় ত তোমার শাখায় কখনো বসে নি আসিয়া শাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্রপুঞ্জে কোকিল ওঠে নি ডাকি'।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পলব-আবেদন
জেগেছে নিশীথে জাগে নি ক' সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
— সব আগে আমি আসি'
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ গিয়াছি গো ভালবাসি!
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর, হোক্ বা না হোক্ দেখা।...
তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আমি আর জাগিব না।
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
— নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ। —

শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই — আজিকে যাবার আগে —
ঐ পলব-জাফরি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে — দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি'?
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি'?

তোমার পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদনী ঘুমাবে যবে,
মূর্ছিতা হবে সুখের আদলে — সে আলোর উৎসবে

মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর?
তোমার নিশাস শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে?
খড়ুখড়ি খুলি' চেয়ে র'বে দূর অস্ত অলখ-লোকে? —
— অথবা এমনি করি'
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধেয়ানে সারা দিনমান ভরি'?

মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, উর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে!
তোমার দু:খ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে! ...

ভুল করে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি'।
যদি ভুল করে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি',
বন্ধ করিয়া দিও পুন: তায়! ... তোমার জাফ্‌রি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে — মাটিতে পেলে না থাকে।

◆ ◆

বস্তুসংক্ষেপ

বাতায়ন-পাশে নিশীথ জাগার সঙ্গীকে কবি বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন, বিদায়ের রাত পাণ্ডুর হয়ে আসছে। জানালার ঝিলিমিলি শুধু নয়, বৃক্ষরাজির সঙ্গে নিরিবিলি আলাপও বন্ধ হয়ে এল। হৃদয়ের সঙ্গে যোগবন্ধন ছিন্ন হচ্ছে বলে আসন্ন বিদায়ের রাত বেদনা ও বিরহে আচ্ছন্ন। নিশীথ রাতের বিদায়ে যেমন তন্দ্রাচ্ছন্নতা, আকুলতা, তেমনি আকাশে অস্তগামী চাঁদের কান্না মুসাফিরকে জাগ্রত হওয়ার জন্য ক্রন্দন করছে। এই মুসাফির হচ্ছেন কবি নিজে। চট্টগ্রাম বাসকালে এ-কবিতা রচিত বলে ঐ-সময়কার কোন গোপনচারিণী নারীর প্রতিচ্ছায়া এখানে আভাসিত। শুধু গুবাকতরুর স্পর্শ নয়, কবিকে সেবা করেছিল কোন মানবীর হস্তস্পর্শও।

কবি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে গুবাক তরুর সঙ্গে তার মধুর মুহূর্তগুলোর কথা বলছেন। গুবাক-তরু ভাষাহীন, উভয়ের কথা বিনিময় হত চোখের ভাষায়। নিঃসঙ্গ রাত-জাগার উত্তপ্ত চোখকে ঐ তরুর পাতা শীতল স্পর্শ দিয়ে স্নিগ্ধ করে দিত। তার পত্রমর্মরে ধ্বনিত হত কবিপ্রিয়ার কণ্ঠবাণী। তার পত্রগুচ্ছে দেখা যেত প্রিয়ার চোখের কাজলরেখা, গুবাক বৃক্ষদেহের মতই দীঘল ঐ নারীর দেহ। নম্র, নত গুবাক-তরুর মধ্যে রয়েছে — দীঘল আকৃতি হলেও প্রেমিকার কুণ্ঠামিশ্র কথা, তার শাড়ির আঁচল ও অঙ্গুলিস্পর্শ।

শ্রান্ত কবি যখন নিদ্রামগ্ন হতেন, তখনও গুবাকের পত্রঝালের তার শিয়রে দুলত, স্বপ্নের মধ্যে পেতেন তার চুম্বনস্পর্শ। কিন্তু জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে গিয়ে কবি ব্যর্থ হয়েছেন। এখন সেই বাতায়ন বন্ধ করার সময় এসেছে। কবির পথে বের হবার লগ্ন উপস্থিত, কেননা তিনি মুসাফির মাত্র।

এই বিদায়ের আয়োজনে বৃক্ষগুলো তাদের অকথিত বাণী উচ্চারণ করতে চাইছে, সে বাণী উভয়ের অন্তরেই শুধু অনুভব করা যাবে। কবি গুবাকবৃক্ষকে যে-রূপে দেখেছেন তা কেবল তারই আরোপিত-রূপ, কবির হৃদয়ই এদেরকে মহিমা ও প্রেমের গভীরতায় মূল্যবহ মনে করেছে। তাই দূরে চলে গিয়েও তিনি সেই হৃদয়-কল্পনা দিয়েই তাদের তাজমহলের মত অমরত্ব দেবেন — যেমন দিয়েছেন কবিতার জগতে। এতদিন এই বৃক্ষে কোন পাখি বাসা বাঁধেনি, এর পত্রকুঞ্জে কোকিল ডাকেনি, অন্য কেউ বাতায়ন খুলে রাত জাগেনি। কবিই প্রথম এদের সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছেন, পত্রপলবে প্রণয়লিপি রচনা করেছেন।

এই নীরব প্রণয় হৃদয়ে নিয়ে কবি হয়ে যাবেন গন্ধধূপের মত নিঃশব্দে প্রজ্বলন্ত। তবু একটি গোপন প্রত্যাশা জাগে, কবির প্রশ্ন কখনও তার প্রিয়া কি কবিকে জানালা খুলে দেখেছে? এখানে অদেখা প্রিয়ার অস্তিত্ব গুবাকতরুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। বৃক্ষপাতায় চাঁদের আলো যখন ঘুমে মূর্ছিত হবে, সেই সুখাবেশের সময় তাদের কি মনে পড়বে কবির কথা।

অথবা প্রেমিকার সুখোৎসবের মুহূর্তে কবির কথা স্মরণে এনে সে কি উদাস হবে? সারা দিন ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকবে — গুবাক বৃক্ষের মত?

মাটিতে বন্দি গুবাকবৃক্ষ, রোদহিমে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এজন্য তার যদি দুঃখবোধ না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কবি নিজের দুঃখকে যুক্ত করতে চান না। ব্যথিতের সঙ্গী হতে পারে কেবল দুঃখীজন। তবুও ভুল করে কবির কথা মনে এলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তা বিস্মৃত হয়ে যায়। অন্যমনস্কভাবে জানালা খুলে ফেললেও তা যেন আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশ-অন্ধকারে কবিকে না খোঁজার কথা বলছেন, কেননা একদিন মাটির ঘরে অর্থাৎ বাস্তবেও তাকে পাওয়া যায়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. 'মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি।'— এই মুসাফির কে?

উত্তর: যে মুসাফিরকে জাগ্রত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, সে মুসাফির হলেন স্বয়ং কবি। চট্টগ্রাম সফরে কবি মুসাফির অর্থাৎ বিদেশে ক্ষণকালের অতিথি। একসময় তাকে বিদায় নিতে হয়, তাই রাত্রিশেষে প্রস্তুত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। নজরুল দুইবার চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন— ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য কবিতাটি দ্বিতীয়বার চট্টগ্রাম অবস্থানকালে রচিত হয়েছিল।

২. গুবাক-তরুর সঙ্গে কবিপ্রিয়ার সাদৃশ্য কি কি?

উত্তর: গুবাক-তরুর পত্রপলব কবির গোপনপ্রিয়ার সুশীতল করতল, শাখার মর্মরধ্বনি তার কণ্ঠবাণী। গুবাকের পাতায় অঙ্কিত হয়ে আছে সেই নারীর চোখের কাজল-লেখা, গুবাকের দীর্ঘদেহের মধ্যে কবি প্রিয়ার দীঘল দেহকেই দেখতে পান। দীর্ঘ পত্রধারায় কবি দেখেন তারই শাড়ির আঁচল, পাতার পাখায় খুঁজে পান তার অঙ্গুলি-স্পর্শের নিবিড় আদর। কবির গোপন-প্রিয়া এ-কবিতায় নির্বাক তরুর রূপকে সংগোপনে উপস্থিত।

৩. কবি কাকে নিয়ে অমরাবতী-রূপে সাজাতে চান?

৪. 'মাটির বন্ধনে বাঁধা' গুবাক-তরু কেন অসহায়?

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আমি আর জাগিব না।
কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
— নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ। —

উত্তর: উদ্ধৃত কাব্যাংশ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি' কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি বিদায়-ব্যথাতুর চিত্তে আত্মাভিমানকে প্রকাশ করছেন।

প্রবাসে আতিথ্য গ্রহণের সময় ঘরের পাশে গুবাক বৃক্ষের সঙ্গে কবির সখ্য গড়ে ওঠে। নিশীথ রাতে একাকী কবি তাদের সঙ্গে মৌন ভাববিনিময় করতেন। তার গোপনপ্রিয়ার প্রতিচ্ছায়াকে খুঁজে পেতেন গুবাকবৃক্ষের পত্রে, স্পর্শে, দীঘলদেহে। আজ বিদায়কালে এই সব সাথীকে পরিত্যাগ করে তিনি চলে যাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা হবে না। অভিমানাহত চিত্তে কবি বিদায় গ্রহণ করে বলছেন যে, তার বেদনাভরা হৃদয়বাণী কাউকে জানাবেন না। বিদ্রোহী কবি উচ্চ চিৎকার করে কিছু দাবিও করবেন না। কামনাবাসনার ধূপ জ্বালিয়ে একাকী নিজেকেই দগ্ধ করে গন্ধ বিলিয়ে যাবেন। অর্থাৎ হৃদয়বেদনার প্রকাশ ঘটাবেন না, ধূপের মত নিজেকে নিঃশেষ করবেন।

আলোচ্য অংশে বিদ্রোহী কবির নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার যে অভিমান প্রকাশ পেয়েছে, তা পরবর্তীকালে বাস্তবতই ঘটেছিল। নজরুল ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মূক হয়ে যান।

২. ... তোমার জাফ্‌রি-ফাঁকে

খুঁজোনা তাহারে, গগন-আঁধারে — মাটিতে পেলেনা যাকে।

উত্তর: উপরিউক্ত পংক্তিদ্বয় কবি নজরুল ইসলাম রচিত 'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি' শীর্ষক কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে কবি তার গোপন প্রিয়াকে লক্ষ করে স্মৃতিবিদ্ধ না হবার কথা বলছেন এবং কবিকে ভুলে যাবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

অতিথি হিসেবে চট্টগ্রামে অবস্থানকালে কবির জীবনে কোন গোপনচারিণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। যে গৃহে কবি ছিলেন তার গবাক্ষপথে গুবাকবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে গোপনপ্রিয়ার প্রতিবিম্বই অবলোকন করতেন। ঐ বৃক্ষগুলি যেন ছিল কবির নিঃসঙ্গ রাত্রির সখা, মর্মসহচর। বিদায়কালে কবি সেই অলক্ষ্য প্রিয়ার উদ্দেশ্যে বলছেন তার জীবনে যদি কখনো স্মরণ-মুহূর্তে জেগে ওঠে কবির স্মৃতি, তবে যেন ঐ গবাক্ষপথে তাকে সন্ধান না করে। রাত্রির অন্ধকার আকাশে সে সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা যাকে মাটিতে অর্থাৎ বাস্তবে পাওয়া গেল না তাকে বিমূর্ত আকাশপথে পাওয়ার দুঃখ বরণ না করাই ভাল। বাস্তবে যে প্রত্যক্ষরূপে পরিচিত হয়নি, তার জন্য হাহাকার করা বৃথা।

মানুষের প্রাপ্তির জগৎ বাস্তব সত্যের উপরে গড়ে ওঠে, অদেখা বিমূর্ত ভাবকে প্রত্যক্ষ স্পর্শের জগতে পেতে হয়। তা ঘটেনি বলেই কবি সেই ব্যর্থ সাধনা থেকে বিরত থাকার কথা বলছেন।

রচনামূলক প্রশ্নের-উত্তর লিখুন

১. "প্রকৃতির প্রতীকে মানবমনের চিরন্তন-বিরহবেদনা প্রকাশিত হয়েছে।"— 'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি' কবিতা অবলম্বনে বক্তব্যটি আলোচনা করুন।
২. 'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি' কবিতায় বিধৃত হয়েছে রোমান্টিক বেদনা ও আকুতি— আলোচনা করুন।
৩. কবিতাটির শব্দভাষা ও ছন্দরূপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১ নং প্রশ্নের নমুনা-উত্তর:

মুসাফির পথিক কবির দৃষ্টিতে গুবাক-তরুর সারি তার গোপন প্রিয়ার প্রতিনিধি। কবিমনের সুখদুঃখ ও বেদনা প্রকাশের মর্মসহচর এইসব বৃক্ষ। জানালার পাশে গুবাক বৃক্ষসারির সঙ্গে তিনি প্রেমভাষণে রত।

প্রথমেই কবি গুবাকবৃক্ষে প্রাণারোপ করে তাদের সঙ্গে ভাববিনিময় করছেন। কারণ, কবি প্রেমিকার রূপকল্পকে প্রকৃতির চিত্রকল্পে আভাসিত করে গুবাক-তরুর মধ্যে সন্ধান করছেন গোপন প্রিয়াকে, অনামিকাকে। এখানে প্রকৃতিই প্রিয়ারূপ ধরে, আবার প্রিয়াই যেন প্রকৃতি হয়ে যায়। একটি উজ্জ্বল ছবি এঁকে কবি তার মধ্যে প্রিয়ার দেহরূপকে তুলে ধরেন; তার বেদনাময়ী বিরহী প্রিয়া আভাসিত হয় অস্ত আকাশ-অলিন্দে্‌ ান কপোল রেখে মুসাফির চাঁদকে জাগানোর চিত্রে, নিঃসীম বেদনার রূপচ্ছবি এখানে অঙ্কিত হয়েছে। আঁধারের এলোচুল প্রিয়ার বেদনাচ্ছন্নতার প্রকাশরূপ।

গুবাক-তরুর বাতাস কবির কাছে প্রিয়ার হস্তস্পর্শ, তার দীর্ঘদেহে প্রিয়ার দীঘল তরুর রূপাভাস, তার পাতায় আঁকা আছে প্রিয়ার চোখের মায়াকাজল রেখা। প্রকৃতি ও প্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্বদ্ধ রচনার ক্ষেত্রে কবি কতগুলি ইন্দ্রিয়ময় শরীরী চিত্র এঁকেছেন। যে নায়িকা দূরের, অপরিচিত ও অদেখা, তাকে যেন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে প্রকৃতির শান্ত মুখশ্রীতে। নারীসৌন্দর্যের স্বরূপকে প্রকৃতিতে এভাবে দৃশ্যমান করে তোলার ফলে তাকে দেহধারিণী রূপে কল্পনা করা সম্ভব হয়। প্রথম প্রণয়ের লজ্জা, সংকোচ, দ্বিধা ইত্যাদির প্রকাশও এখানে প্রিয়াকে সত্য করে তুলেছে। রোমান্টিক চিত্তের ধর্মই হল প্রেম ও প্রিয়াকে বাস্তবের চেয়ে প্রকৃতিজগতের সঙ্গে বেশি করে অবিচ্ছেদ্য করে তোলা। কবির প্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে বলে গুবাক-তরুর মধ্যে প্রকৃত অর্থে প্রিয়াকেই রূপায়িত করা হয়েছে। বস্তুত প্রেমস্পর্শে মন্দ্রিত কল্পিতজগৎ এভাবেই রোমান্টিকদের কাছে প্রকৃতিনির্ভর হয়ে ওঠে। কবি নজরুলের নারীপ্রতিমা বিদেহী বা বিমূর্ত কোন সত্তা নয়, সে সর্বদা শরীরধারী গোপনচারিণী, কখনো রূপলাবণ্যময়ী পবিত্র নারী, কখনও কিশোরীর মত নম্র, নত, চকিত পদচারিণী। ফলে প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে তাকে কল্পনা দিয়ে গড়ে তুলতে হয়। বাতায়ন-পাশের গুবাক বৃক্ষে তাই প্রিয়ার দেহরূপ যেমন আভাসিত, তেমনি কবির ভাববিনিময়ও ঘটে তার সঙ্গে। সমাজসচেতন বিদ্রোহী নজরুলের নিঃসঙ্গ-বিরহ-বেদনার্ত রূপটি এ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

২ নং প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

প্রেম ও সৌন্দর্যের জন্য চির-সন্ধান ও বেদনা প্রকাশই রোমান্টিক কবিচিত্তের ধর্ম। অপ্রাপ্তির হাহাকার রোমান্টিককে সবসময় বেদনাতুর করে রাখে, প্রেমের জন্য চিরতৃষ্ণাই এখানে মুখ্য। আলোচ্য কবিতাটিতে এই বেদনা ও অতৃপ্তি তীব্রভাবে প্রকাশিত। গুবাকতরুর সারিকে অবলম্বন করে উন্মোচিত হয়েছে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের চিরন্তন আবেগরূপ।

নজরুলের কবিতায়, বিশেষত প্রেমমূলক কবিতায় পাওয়া-না-পাওয়ার বিরহ বিধুরতা সবসময় প্রধান সুর হয়ে ওঠে। কখনো গোপনপ্রিয়া, কখনো বা নিষ্ঠুর-প্রিয়া তাঁকে আহত ও রক্তাক্ত করে। কবি তার জন্য ক্রন্দনাকুল হয়ে থাকেন। নিরুদ্ধ আবেগ নিয়ে একাকী ধূপের মত দগ্ধ হতে থাকেন। উলিখিত কবিতায় একজন গোপনপ্রিয়ার আভাস লক্ষণীয়, কবির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু কল্পনায় সে কবির হৃদয়ে সর্বদাই উপস্থিত, তার প্রতি আবেগ প্রকাশে তিনি করুণ বেদনাবিহ্বল; বস্তুত, না-পাওয়াকে কেন্দ্র করেই রোমান্টিকের চিত্ত ও কল্পজগতে অভিসার করে। প্রকৃতিবিশ্বে, এখানেও রয়েছে গুবাক বৃক্ষে কবির অতৃপ্ত প্রেমের রূপদর্শনের আকুলতা, চিরন্তন প্রেমের জন্য তীব্র অন্বেষণ। পাণ্ডুর, বিদায়, অস্ত, শীর্ণ, বেদনা, ক্ষতি, শূন্য, নিশ্চল, নিশ্চুপ, বিধুর, নিরাশ, শূন্য, গগন-আঁধার ইত্যাদি শব্দ রোমান্টিক বিরহের ব্যাকুল-উচ্চারণ। নিঃশেষে নিজের বেদনাভারকে নিবেদন করে রোমান্টিক চিত্ত তার চিরতৃষ্ণাকে ব্যক্ত করে। এখানেও আত্মদহনের মধ্যে, একাকী ধূপদগ্ধ হওয়ার মধ্যে সেই তৃষ্ণার রূপচিত্র আঁকা হয়েছে। 'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি' কবিতায় নজরুলের ব্যক্তিস্বভাবের ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই রোমান্টিক কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে।

৩ নং প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ [সংকেত]

প্রশ্নের উত্তরটি নিজে প্রস্তুত করুন। শব্দরূপ বলতে চিত্ররচনা ও অলঙ্কার, বিশেষণ ইত্যাদি বোঝায়। আর ছন্দের ক্ষেত্রে দেখুন কবিতাটি মাত্রাবৃত্তে রচিত— মন্থর ও দীর্ঘগতির মাত্রাবৃত্ত। দৃষ্টান্তঃ 'বিদায়, হে মোর/ বাতায়ন-পাশে/নিশীথ জাগার/সাথী ! ওগো বন্ধুরা,/পাণ্ডুর হয়ে/ এল বিদায়ের/রাতি'।

পাঠ-৪

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪)

উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠশেষে আপনি—

- এই কবিতা পাঠশেষে আপনি আধুনিক বাংলা কবিতার তিরিশের যুগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন, ঐ যুগে রচিত কবিতার বিষয় ও রূপরীতি বিশেষণ করতে পারবেন।
- কবিতাটির ভাববস্তু আলোচনা করে ইতিহাসবোধ ও ব্যক্তিমানুষের প্রার্থিত চিরন্তন মানবী সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশ করতে পারবেন।
- কবিতার ভাষা, অলঙ্কার ও রচনারীতি বিশেষণ করতে পারবেন।

লেখক-পরিচিতি

বিশ শতকের তিরিশের দশকে আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রগণ্য কবি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্র-পরবর্তী নতুন কবিতার ধারা প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা প্রধান। প্রকৃতি, আবহমান সময় ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক চৈতন্যের সংযোগে তিনি সৃষ্টি করেন এক অভিনব শিল্পজগৎ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলা শহরে তাঁর জন্ম, পিতা সত্যানন্দ দাশ, মাতা কবি কুসুমকুমারী দাশ। বংশগতভাবে তাঁর পূর্বপুরুষ হিন্দু হলেও পিতামহ সর্বানন্দ দাশ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। পরিবারটি ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চা ও আদর্শ জীবনযাপনের মধ্যে পরিশীলিত।

বরিশালেই জীবনানন্দের স্কুল ও কলেজ জীবন অতিবাহিত হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৯-এ ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৯২১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। তারপর আইন পড়ার জন্য ভর্তি হলেও অসুস্থতার জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন নি। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। একসময় ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবেও কাজ করেছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৬-এ জীবননান্দ স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। কর্মজীবনে মাঝে মাঝে চাকরিচ্যুত হয়েছেন বা নিজেই পরিত্যাগ করেছেন। তবে মূলত অধ্যাপনা পেশাতেই তিনি ছিলেন নিয়োজিত।

তাঁর সাহিত্যজীবনই ছিল প্রকৃত জীবন, এই জীবনেই তিনি সর্বতোভাবে ছিলেন নিবেদিত। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এ, 'বর্ষ-আবাহন' নামে। তিরিশের দশক থেকেই জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির বলিষ্ঠ ও স্বকীয় রূপটি উন্মোচিত হতে থাকে। ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগন্থ 'ঝরাপালক'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) কাব্যে জীবনানন্দের মৌলিক কবিস্বভাব ও আধুনিক কাব্যরীতির প্রকাশ ঘটে, যাকে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেন 'চিত্ররূপময়' বলে। তাঁর কাব্যবিষয় প্রধানত প্রকৃতি-ভূগোল-ইতিহাস-প্রেম-নারী-মৃত্যুচেতনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসক্ষেত্রে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা-বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি খুঁজেছেন মানব-অস্তিত্বের নৈতিকতা ও হৃদয়সত্তার স্বরূপ। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যের বিপুল ঐশ্বর্য তাঁকে প্রাণিত করেছে, ইতিহাসজ্ঞান দিয়েছে সংশয় ও নৈরাশ্যের ক্ষেত্রে আলোর ইশারা। জীবনানন্দ চিত্রকল্পের বিস্ময়কর ভূবন রচনা করেছেন, কাব্যভাষার স্বতন্ত্র রূপ গড়েছেন এবং আধুনিক কলাকৌশলে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কবিতার আঙ্গিক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: **ঝরাপালক** (১৯২৯), **ধূসর পাণ্ডুলিপি** (১৯৩৬), **রূপসী বাংলা** ১৯৩৩), **বনলতা সেন** (১৯৪২), **মহাপৃথিবী** (১৯৪৪), **সাতটি তারার তিমির** (১৯৪৮), **বেলা অবেলা কালবেলা** (১৯৬১)। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যাও বিপুল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে জীবনানন্দ ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি কথাসাহিত্যেরও রচয়িতা, তদুপরি রয়েছে প্রবন্ধপুস্তক। প্রচলিত রূপরীতি বর্জন করে ছোটগল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন নতুন ধরনের আঙ্গিক। আধুনিক ব্যক্তিমানুষের উজ্জ্বল জীবনবেদ ও বেদনার রূপ উন্মোচন করেছেন জীবনানন্দ; যেখানে আশা ও নৈরাশ্য, বাস্তব ও পরাবাস্তব, অন্ধকার ও আলো আন্তরবৈপরীত্যে কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মায়াবী অপরূপ বিষণ্ণতা ও বেদনার গভীর তাৎপর্য তাঁর কবিস্বভাবের মূলরূপ। পরবর্তী বাংলা কবিতার অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

পাঠ-পরিচিতি

'বনলতা সেন' কবিতাটি 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়, পৌষ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে। কবির ব্যক্তিজীবনে বনলতা সেন নাম্মী কোন নারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'কারুবাসনা' নামক উপন্যাসে — যা তাঁর আত্মজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বহন করে, বনলতা নামটির উলেখ রয়েছে।

মূলপাঠ

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পান্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

◆ ◆

বস্তুসংক্ষেপ

পথিক-চিত্তের অবিরত ভ্রমণ যেমন জীবনধর্ম, তেমনি প্রশান্তির আশ্রয় সন্ধানই জীবনের উদ্দেশ্য। এই পথিক হাজার বছর ধরে পথ চলছে অর্থাৎ চেতনা উন্মেষের শুরু থেকেই তাঁর এই পথচলা। সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর পর্যন্ত যেমন সে নাবিক হয়ে জলপথ ভ্রমণ করেছে সুদূর অতীত থেকে, তেমনি স্থলপথেও ঘুরেছে বিম্বিসার-অশোকের ধূসর কাল থেকে। ফলে পথিকচিত্ত ক্লান্ত, জীবনের সফেন সমুদ্রের মাঝখানে অর্থাৎ গতিতরঙ্গের ফেনায় পুঞ্জীভূত জীবনের অস্থিরতার মধ্যে পথিক পেয়েছে শান্তিদায়িনী বনলতার সংস্পর্শ। নাটোর নামক স্থানের উলেখ করে বনলতাকে একান্ত, নিজস্ব মানবী সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে অতীত স্থানকাল বর্তমানের স্থানের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে।

এই বনলতা সেন অন্ধকারের ঘনত্বে আবৃত, তার চুল, মুখ ও চোখের বর্ণনায় ফুটে ওঠে ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য ও রোমান্টিক রূপমাধুরী। বনলতা সেনের কেশরাশি অতীতের বিদিশা নগরীর রাত্রির মত অন্ধকার অর্থাৎ প্রগাঢ় কালো। তার মুখচ্ছবিতে শ্রাবস্তী নগরীর কারুকার্য, অতীতের ক্ল্যাসিক রূপসুষমায় সে গঠিত। কিন্তু তার চোখ পাখির নীড়ের মত নিবিড় আশ্রয়ের প্রতীক অর্থাৎ শ্রান্ত জীবনের জন্য সে বহন করে অনাবিল প্রশান্তি ও স্থিরতা। গভীর সমুদ্রে জাহাজের নাবিক হাল ভেঙে গেলে নাবিক যখন দিশাহীন হয়ে পড়ে, তখন কোন দারুচিনি সবুজ দ্বীপ দেখতে পেলে আশ্বস্ত হয়। ব্যক্তিমানুষও তার নিরুদ্দেশ, উন্ম ল জীবনের ক্লান্ত-শ্রান্ত ভ্রমণের শেষে নিজ নিজ মানবীসত্তার চোখে সন্ধান করে স্থিতি ও শান্তি। এই

মানবীসত্তাও যেন ক্লান্ত পথিকের জন্য থাকে অপেক্ষমান। নিরাশ্রয়ী চিত্তের জন্য সৌন্দর্য ও প্রশান্তির জগৎ তৈরিই কবির লক্ষ্য।

দিনশেষের চিত্র এঁকে কবি প্রাণের গতিমুখ তথা মৃত্যুর ইঙ্গিত প্রকাশ করেছেন। সন্ধ্যায় নিভে যায় পৃথিবীর রঙ-আলো, চিলের ডানায় রৌদ্রের গন্ধ থাকে না অর্থাৎ জীবনের উজ্জ্বলতা থাকে না। সবকিছু আবৃত হয় এমন এক অন্ধকারে, যেখানে আশ্রয়, মৃত্যু এবং একই সঙ্গে থাকে নতুন সৃষ্টিশীলতার আয়োজন। ছায়া-অন্ধকারের মধ্যেই কবি দেখেন তার প্রার্থিত সত্তার অস্তিত্ব। তখন এক চলার বাস্তবতা থেকে কবি প্রবেশ করেন আরেক বাস্তবতায় যাওয়ার আয়োজনে। পাণ্ডুলিপি যেমন কোন লিখিত গ্রন্থ নয়, গ্রন্থের পূর্বরূপ মাত্র। পাণ্ডুলিপি রচনার আয়োজন হয় অন্ধকারে জোনাকীর আলোতে অর্থাৎ কোন অপার্থিব মুহূর্তে — যেখানে পাখি ও জীবননদীর সব চলা ও চাওয়াপাওয়া নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু জেগে থাকে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা — বনলতা সেন সেই সৃষ্টিসত্তারই প্রতীক।

অন্ধকার-মুহূর্তে সে সত্য হয়ে ওঠে, এই মুহূর্তটি হচ্ছে এক সত্তা থেকে আরেক সত্তায় উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী স্তর। এর পরে সব কথকতা গড়ে উঠবে অন্ধকারস্থিত বনলতা সেনের সঙ্গে, যে চিরমানবীর রহস্যে অন্ধকার-তুল্য। কবিতাটিতে ইতিহাসজ্ঞান ও প্রাকৃতিক জীবনের স্থিরতর শান্তি মিশিয়ে কবি স্থাপিত করেছেন তাঁর বনলতা সেনকে তথা চিরন্তন সত্তাকে।

টীকা

সিংহল সমুদ্র — বর্তমানে শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্র, পূর্বনাম সিংহল। এর নিকটস্থ সমুদ্রকে বলা হচ্ছে সিংহল সমুদ্র।

মালয় সাগর — পূর্বে মালয় ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উপদ্বীপ। সংলগ্ন দ্বীপগুলি একীভূত হয়ে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। মালয়ের নিকটস্থ সাগরকে মালয় সাগর নামে কবি অভিহিত করেছেন।

বিম্বিসার — খ্রি:পূ: ৫৩৭ থেকে খ্রি: পূ: ৪৮৫ পর্যন্ত বিম্বিসার ছিলেন প্রাচীন মগধের সম্রাট। বুদ্ধদেবের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন।

অশোক — প্রাচীন ভারতের মৌর্যবংশের তৃতীয় সম্রাট। তার পিতা বিন্দুসার। সম্রাট অশোক খ্রি: পূ: ২৭৩ থেকে খ্রি: পূ: ২৩২ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রথম জীবনে ছিলেন নিষ্ঠুর ও নৃশংস প্রকৃতির, তার উপাধি ছিল 'চণ্ডাশোক'। যুদ্ধক্ষেত্রে অজস্র সৈন্যের মৃত্যু দেখে অনুতপ্ত হয়ে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। পরবর্তী জীবনে ছিলেন প্রজাবৎসল ও ধর্মপ্রচারক; পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীলংকায় পাঠিয়েছিলেন। 'চণ্ডাশোক' হয়ে ওঠেন 'ধর্মাশোক।'

বিদর্ভ — প্রাচীন ভারতের রাজ্য। বর্তমানের নাম বেরার প্রদেশ।

নাটোর — বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলের একটি শহর। রাণী ভবানীর রাজত্বকালে রাজধানী ছিল।

বিদিশা — প্রাচীন ভারতের একটি নগরী; মালব রাজ্যের অন্তর্গত। আধুনিক নাম ভিলসা, গোয়ালিয়রের নিকটে অবস্থিত।

শ্রাবস্তী — প্রাচীন ভারতের নগরী। আধুনিক নাম 'সাহেত মাহেত'। বুদ্ধদেবের সময়ে এখানে একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. 'হাজার বছর ধরে' কবি কোথায় পথ পরিভ্রমণ করছেন?

উত্তর: কবি পথিক ও নাবিক — দুইরূপেই সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটছেন। সমুদ্র-পথে তিনি ভ্রমণ করেছেন সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর এলাকা পর্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলপথ। প্রাচীনকালে ভারত জলপথে উক্ত অঞ্চলে বাণিজ্যের প্রসার ও ধর্মসংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছিল। পথিক হিসেবে কবি যে অতীত স্থানে ভ্রমণ করেন তা হচ্ছে প্রাচীন ভারতের বিম্বিসার, অশোক প্রভৃতি সম্রাটের রাজ্য-নগর-নগরী। চিরকাল থেকেই এই দুটো ভ্রমণ-পথে মানুষ অতীত থেকে পৃথিবী পরিক্রমা করছে — কোন অম্বিষ্ট সত্তাকে পাবার লক্ষ্যে।

২. 'নাটোরের বনলতা সেন' কি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?

উত্তর: হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে ক্লান্ত কবি আশ্রয় খুঁজে পান নাটোরের বনলতা সেনের কাছে। অবিরত ভ্রমণকারীর জন্যে কোন ভৌগোলিক সুনির্দিষ্ট অবস্থান নেই — সর্বত্রই তার পরিক্রমা। কিন্তু এখানে কবি তথা পথিক নাটোর নামক মফঃস্বল শহরের নাম উলেখের মধ্যদিয়ে নির্মাণ করতে চেয়েছেন একান্ত নিজস্ব একটি স্থান ও মনোলীন নারীপ্রতিমা। ব্যক্তিমানুষের মনোজগতেই কাঙ্ক্ষিত নারীর কল্পিত অস্তিত্ব থাকে। নাটোর শহরের বনলতা সেন তাই কবির বিশ্বভ্রমণের পথযাত্রায় একটি আকাঙ্ক্ষিত স্থাননাম, সেখানে তিনি যাত্রা শেষে প্রশান্তি ও বিরাম লাভ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষই অনিশ্চয়তার ভূগোল ও অস্থায়ী সময়প্রবাহে চিহ্নিত করে নেয় নিজস্ব একটি জগৎ ও তাতে অধিষ্ঠিত করে প্রার্থিত সত্তারূপকে।

৩. 'পাখির নীড়ের মত চোখ'— কথাটির তাৎপর্য কি?

উত্তর: এটি একটি উপমা। হাজার বছর পথ চলার পর ক্লান্ত কবি তার মনোলীনার কাছে আশ্রয়প্রার্থী হন। পাখির বাসার মত চোখ তুলে এই নারী কবিকে দেয় পরমাশ্রয় ও প্রশান্তি। দিনশেষে পরিশ্রান্ত পাখি যেমন নীড়ে প্রত্যাবর্তন করে, তেমনি কবিও দীর্ঘ পথযাত্রা শেষে নীড়সন্ধানী হন। এই নীড়ে আছে শান্তি ও বিশ্রাম। বনলতা সেনের চোখে এই নীড়ের প্রতিচ্ছবি দেখেন কবি। নিবিড় মমতাময় পাখির নীড়ের ইমেজে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে অবিরাম পরিভ্রমণের গন্তব্যস্থলটি। প্রার্থিতজন মাত্রেই আশ্রয়হীন মানুষের কাছে এক-একটি নীড়সদৃশ।

৪. কবিতাটিতে কতবার ও কি অর্থে 'অন্ধকার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর: 'বনলতা সেন' কবিতায় সর্বমোট পাঁচবার অন্ধকার শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। আধুনিক কবিতায় শব্দ মাত্রই বহুমাত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, রূপগত দিক থেকেও গ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র, কখনও তা উপমা, কখনও বা রূপক, চিত্রকল্প অথবা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এখানে প্রথম স্তবকে দুটি স্থানে 'অন্ধকার' দুই তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিশীথের অন্ধকারে' অর্থ ইতিহাসের পথ-ভ্রমণের কথা বলা হচ্ছে — অন্ধকার অর্থাৎ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মানুষ তার পথ চলছে। 'দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে' — বাক্যটিতে অন্ধকার হচ্ছে অতীত স্থানকাল। দ্বিতীয় স্তবকে 'অন্ধকার বিদিশার নিশা' উপমা হিসেবে বনলতা সেনের কেশরাশির ঘনত্ব ও বিপুলতা ব্যক্ত করছে। চতুর্থ 'অন্ধকার' শব্দটি কবির ব্যক্তিমনের বর্তমান ক্লান্তি, দিশাহীনতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের চিত্র তুলে ধরেছে। শেষ 'অন্ধকার' বহন করছে মৃত্যুর অন্ধকার। জৈবিক জীবন ও মানুষের জীবন সবকিছুই এক সময় স্থিরতায় বিরাম লাভ করে। সেই স্থিরতা সন্ধ্যার মতই নির্জন ও অন্ধকার।

৫. কবিতায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক স্থাননামের তাৎপর্য কি?

৬. 'পাণ্ডুলিপি' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত ?

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দন্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

উত্তর : উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয় জীবনানন্দ দাশ রচিত 'বনলতা সেন' কবিতা থেকে সংকলিত। এখানে ক্লান্ত ও নিরাশ্রয়ী কবিচিত্ত তার মানবীসত্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে।

কবি পথিক ও নাবিক — দুই রূপেই সুদূর অতীত থেকে পথ ভ্রমণকারী। সভ্যতার যাত্রাপথ সর্বদাই অতীত থেকে ভবিষ্যতে প্রসারিত। মানুষ শুভ্র, সুন্দর ও কল্যাণের জন্য চির-কাঙ্ক্ষিত। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষই এই সমবেত চলার অন্তর্গত হলেও তার রয়েছে নিজস্ব প্রার্থনা ও আশ্রয়ের লক্ষ্য। জীবনসমুদ্রের ফেনপুঞ্জে ভাসমান ব্যক্তিমানুষ একসময় পরিশ্রান্ত হয়, আত্মনিবেদন করত চায়। বনলতা সেন সেই আশ্রয়কেন্দ্র ও শান্তিপ্রদায়িনী। হাজার বছর ধরে ভ্রাম্যমান শ্রান্তচিত্তকে সে দেয় পরম আশ্রয়। যদিও সে আশ্রয় দুদণ্ডের মত ক্ষণকালীন, তবু মানুষ তার কাছেই যেতে চায়। নাটোর নামক স্থান উলেখের মধ্যদিয়ে ব্যক্ত হয়েছে বনলতা সেনের সঙ্গে কবির একান্ত সম্পর্ক। পৃথিবীর অতীত কাল, ইতিহাসের স্থান-নামের পাশে নাটোর নামটি যেন বর্তমানের ইঙ্গিতবহ, আরেকদিকে অনির্দিষ্ট, নানা স্থানে ভ্রমণকারী ব্যক্তির জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানা। এখানে জীবনের ক্লান্তরূপ, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে ভাসমান চিত্ত এবং নির্দিষ্ট স্থিতির মধ্যে অপেক্ষমান প্রশান্তিদায়িনী নারী — এই তিনটি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

২. .... ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পান্ডলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল

উত্তর : আলোচ্য অংশটুকু জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি অন্ধকারের মধ্যে নিহিত নতুন সৃষ্টিশীলতার কথা বলেছেন।

দিনশেষে চিলের ডানায় রৌদ্রের গন্ধ থাকেনা অর্থাৎ সূর্যের আলো নিভে যায়, ছায়াময় অন্ধকারে ঢেকে যায় পৃথিবী। এই অন্ধকারে কবির মন গভীর আস্বাদ ও আশ্রয় খুঁজে পায়। কার — অন্ধকারেই সুপ্ত থাকে সৃষ্টিক্ষমতার বীজ। দিনাবসানে রাত্রি ও আবার দিনের আরম্ভ — এই পরিক্রমায় রাত্রির ভূমিকা হচ্ছে পাণ্ডুলিপি রচনার আয়োজন করা অর্থাৎ নতুন সুষ্টির পরিবেশ তৈরি করা। এই পরিবেশ জোনাকির রঙ অর্থাৎ জৈবআলোতে ঝিলমিল করছে। অন্ধকারে যে গল্পের পাণ্ডুলিপি রচনার আয়োজন ঘটছে তা জৈবপৃথিবীর সৃষ্টিক্ষমতায় বিমণ্ডিত। এর মধ্যেই পূর্বসত্তা থেকে অন্য আরেকটি সত্তার জন্মসম্ভাবনা নিহিত। কবি এখানে সেই অপার্থিব মুহূর্তের মধ্যে একই সঙ্গে দেখছেন অবসান ও পুনর্জন্মের পূর্বাভাস।

৩. সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এজীবনের সব লেনদেন।
থাকে শুধু অন্ধকার, মখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

উত্তর : [সংকেত]

পাখির স্থিরতা, নদীর স্থিরতা, জীবনের স্থিরতা — তিনটি অবসানের রূপ উপস্থাপিত। অন্ধকারের মধ্যে এদের স্থিরতা মৃত্যুসদৃশ। মৃত্যুর পরেও যে চিরায়ত মানবী থেকে যায়, সেই হচ্ছে বনলতা সেন। সে চিরন্তন মানবী — যাকে পাওয়া যায় ভ্রমণ-ক্লান্ত জীবনের অবসান মুহূর্তে অথবা অন্ধকারের নিবিড়তায়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. "ইতিহাস-ভূগোলের পটে ব্যক্তিগত প্রেমের উপস্থাপনাই 'বনলতা সেন' কবিতার আধেয়"। — আলোচনা করুন।
২. 'বনলতা সেন' কোন্ ধারার কবিতা? প্রসঙ্গত কবিতাটির শিল্পরূপ আলোচনা করুন।
৩. 'বনলতা সেন' কবিতার মূলভাব ব্যক্ত করুন।
৪. 'বনলতা সেন' কি গীতিকবিতা? কবিতাটির নামকরণ কতটুকু যথাযথ?

১ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

'বনলতা সেন' কবিতার বনলতা নাটোর অঞ্চলের অধিবাসী হলেও প্রকৃত অর্থে সে ব্যক্তিহৃদয়ের প্রেমের স্মৃতিসত্তা এবং ইতিহাস-ভূগোলে প্রসারিত প্রতীকীসত্তা। অস্পষ্ট, ধূসর ও সুদূর অতীতের দেশকালে স্বপ্নময় স্মৃতিমন্থনের কবিতা হলেও শেষ পর্যন্ত মূলসুরটিতে ধ্বনিত হতে থাকে বর্তমান ব্যক্তিমানুষের কাহিনী। এই ব্যক্তিমানুষ বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকের অন্ধকার সময়পর্বের অধিবাসী। সে নিরাশ্রয়ী, উন্মূলীত এবং প্রেম থেকে বিচ্যুত। অতীতের সহস্র বৎসরের সভ্যতার পথ পরিক্রমা করেও আজকের মানুষ ক্ষয় আর অন্ধকারের সম্মুখীন।

জীবনানন্দ একাকিত্ব, আত্মমগ্নতা ও নির্জনতার কবি। তাঁর চেতনাকে ঘিরে থাকে বিচ্ছিন্নতার বেদনা, ব্যর্থতার বিষাদ ও গভীর অবসাদ। এই নিঃসঙ্গতা ও অবসাদ থেকে তিনি মুক্তি খোঁজেন ইতিহাসে, প্রকৃতিতে এবং নারীপ্রতিমায়। ফলে তাঁর কবিতায় সময়প্রবাহের এক অবিছিন্নতা রচিত হয়, বর্তমানের সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয় যেমন নাটোরের বনলতা সেন, তেমনি তাতে মিশে থাকে অতীতের ধূসর দেশকাল। চিরন্তন মানবের জন্য চিরন্তন মানবী-অপেক্ষমান থাকে, তারই জন্য মানব প্রাচীন ইতিহাসের বৃত্তান্ত থেকে জ্ঞান আহরণ করে। বর্তমানের জীবন- অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে জ্ঞানের মিশ্রণে বনলতা সেন হয়ে ওঠে চিরকালীন অর্থাৎ ইতিহাস-ভূগোলের পটই তাকে করে সর্বকালীন। কিন্তু বর্তমানের অন্ধকারে সে একান্তই কবির ব্যক্তি হৃদয়ের প্রতিমা, যার কাছে তিনি আশ্রিত ও সমর্পিত। এ-যুগের মানবমনের প্রেম অচরিতার্থ ও নারীপ্রতিমা বাস্তবে অন্তর্হিতা। দিনের বাস্তব রৌদ্রালোকে তাকে পাওয়া যায় না, তাই অন্ধকার-মুহূর্তে রচিত হয় পান্ডুলিপি — পাশাপাশি বসে-থাকার মহামুহূর্ত। ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিমানুষের প্রেমসত্তাই ভ্রমণ করে ইতিহাসের পথ, ভূগোলের মানচিত্র।

আজকের ব্যক্তিমানুষ জ্ঞানময় প্রেমিক, তার সত্তা জৈবজীবনের আনন্দপ্রত্যাশী, আবার মননশুদ্ধ হাওয়ার জন্যও উদ্বেলিত। সভ্যতার অবক্ষয় ও বিপর্যয়ে সে আশ্রয় খোঁজে ইতিহাসের প্রজ্ঞালোকে এবং নারীর মধ্যেই রয়েছে সেই প্রজ্ঞার উৎস। ফলে আধুনিক ব্যক্তির স্বরূপটি এখানে প্রতিবিম্বিত হয়। এই মানুষ যেমন একজন ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্র, তেমনি ইতিহাস-ভূগোলের জ্ঞানপ্রকর্ষেও ঋদ্ধ। তাই ব্যক্তির প্রেম প্রজ্ঞাপথবাহী, বনলতা সেন হয়ে ওঠে সভ্যতার প্রেক্ষাপটে, হৃদয়বাসনার সত্তারূপ, বর্তমানের বিপর্যস্তকালে যে অন্ধকারে আবৃত।

২ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশের দশকের কাব্যধারায় 'বনলতা সেন' একটি আধুনিক কবিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এই ধারার সূচনা করেন প্রধানত পাঁচজন কবি— জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তী। যুদ্ধ-পরবর্তী জীবন ও সভ্যতার ক্ষয়-বিপর্যয়, দর্শন-বিজ্ঞান-মনস্তত্ত্বচিন্তার নতুন তত্ত্ব, রোমান্টিসিজমের পরিবর্তে মর্ডানিজমের উত্থান এবং শিল্পীরীতির পৃথক চরিত্র উক্ত কাব্যধারাকে গড়ে তোলে। মননশীল চিন্তাচেতনা, আন্তর্জাতিকতা, নগর চেতনা, হতাশা ও অবক্ষয়, দেশকাল-ইতিহাস সম্পর্কিত নতুন দৃষ্টিকোণ এই কবিতার প্রধান বিষয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গে পার্থক্য রচনা এবং য়ুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যধারার বৈশিষ্ট্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিরিশের কবিতা বিকশিত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও স্বকীয় কাব্যরীতির উদ্ভাবন ও চর্চার মধ্য দিয়ে এর শক্তিশালী প্রকাশ । এই পাঁচ কবির প্রবর্তিত কাব্যদর্শনই বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারার উৎসভূমি।

জীবনানন্দ দাশ এ-ধারার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও স্বতন্ত্র রীতির কাব্য রচয়িতা। তিনি ইতিহাস-সময়, মৃত্যুবোধ, প্রকৃতিচেতনা এবং ব্যক্তিহৃদয়ের বেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে এক পৃথক ভাষাজগৎ তৈরি করেছেন। 'বনলতা সনে' কবিতাটিতে ইতিহাস-ভূগোল, সময় প্রবাহ, চেতন ও নিশ্চেতন জগৎ এবং প্রেমনির্ভর অন্বিষ্টসত্তার বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে। আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য হল বহুমাত্রিক চেতনাকে প্রকাশ করা ও নতুন শিল্পরীতি তৈরি করা। আলোচ্য কবিতাটি প্রথাগত বাংলা কবিতার গীতিকবিতার মত হয়েও প্রকৃতপক্ষে এর রূপরীতি সম্পূর্ণ পৃথক।

কবিতাটিতে তিনটি স্তবকে বিন্যস্ত আঠার পংক্তির সমাহার ঘটেছে। প্রথম স্তবকে ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে বিশ্বমানবব্যক্তির সংযোগ, দ্বিতীয় স্তবকে উদ্দিষ্ট সত্তার দেহীরূপ ও তার পরিচয় এবং শেষ স্তবকে ব্যক্তির সঙ্গে ঐ সত্তার সান্নিধ্য রচনা করা হয়েছে। এসব উপস্থাপনায় বিজড়িত রয়েছে সময়প্রবাহ, সভ্যতার আলো-অন্ধকার, জৈবপ্রাণের আনন্দ, একালের বিক্ষত ও ক্লান্ত ব্যক্তিমনের বেদনা ইত্যাদি বিষয়।

কবিতাটিতে উপমা ও শব্দ ব্যবহারের রয়েছে বিশিষ্ট রীতির প্রকাশ। উপমা শুধু তুলনা অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, চিন্তা ও মনোভাবের বর্ণনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' — উপমাটি চোখের উপমা নয়, মনোভাবের উপমা। নীড়ের মমতার্স্নিগ্ধ আশ্রয় যেমন পাখির কাম্য, বনলতা সেনের চোখও তেমনি ক্লান্ত পথিকের

নীড়স্বরূপ। 'অন্ধকার' শব্দটির বহুবিধ অর্থ রয়েছে। একই শব্দে নানামাত্রিক ব্যবহার আধুনিক কাব্যরীতির বৈশিষ্ট্য। শব্দ দিয়ে তৈরি করা হয় চিত্রজগৎ, যেখানে ইন্দ্রিয়, অনুষঙ্গ, রঙ-আলো ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। কবিতাটিতে দৃষ্টি ও স্পর্শ ইন্দ্রিয় ব্যবহৃত, রঙের ক্ষেত্রে রয়েছে কালো, ধূসর, সাদা ও সবুজ বর্ণ। প্রত্যেকটি রঙই অর্থের দ্যোতক, যেমন ধূসর হচ্ছে ক্লান্তি ও সভ্যতার ক্ষয়ের প্রতীক, সবুজ জীবনের প্রতীক ইত্যাদি। এখানে আরও ব্যবহৃত হয়েছে ক্লাসিক স্থাপত্য হিসেবে শ্রাবস্তীর কারুকার্য, বিদিশার নিশা ইত্যাদির সঙ্গে রোমান্টিক কল্পনার মিশ্রণ — নাবিকের সমুদ্র বিহার, পাখির নীড়ে প্রত্যাবর্তন, অন্ধকারে বসে-থাকার বনলতা সেন প্রভৃতি রূপাশ্রয়।

আধুনিক কাব্যরীতিতে ছন্দ ব্যবহৃত হয় স্বাধীনভাবে। কবির মনোভাব ও চিন্তা অনুযায়ী ছন্দের গঠন নির্মিত হয়ে থাকে। পংক্তির শেষে মিল থাকা অনিবার্য নয়, এখানে মিল থাকে পংক্তির মধ্যে। একে বলা হয় অন্তর্মিল, যেমন, 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' বস্তুত, 'বনলতা সেন' কবিতাটি আধুনিক কাব্যরীতির অভিনব প্রকরণকলা আবিষ্কারে ও ব্যবহারে সার্থক।

৩ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তর: (সংকেত)

প্রকৃতি ও সভ্যতা জীবনের অবলম্বন, প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জীবন রচনা করে চলে সভ্যতার বৈচিত্র্য ও বৈভব। প্রথম ও দ্বিতয়ি বিশ্বযুদ্ধ উক্ত অবলম্বনকে করেছে প্রশ্নসাপেক্ষ, ব্যক্তিমনকে করেছে নিরাশ্রয় ও সংশয়ী। তবুও কবি তাঁর কবিতায় সৃষ্টি করে চলেন অমেয় আশা ও আশ্বাসের মাধুরী। মৃত্যু, কালের বিনাশ ও ইতিহাসের ধ্বংসরূপ সত্ত্বেও আমাদের জন্য থাকে প্রেম, থাকে বনলতা সেন নামক আধেয়। জীবনানন্দ মৃত্যু, ধূসরতা ও অনাশ্রয়ের মধ্যে সভ্যতার বৈচিত্র্যে, প্রকৃতির নিযার্সে রচনা করেছেন বনলতা সেনের সুনিবিড় মায়া-অস্তিত্ব। সে আমাদের অন্বিষ্টসত্তা, আমাদের ক্লান্তির ও অবিরাম ভ্রমণের শেষে একটি গন্তব্য ও সম্পর্কের আশ্বাস। আধুনিক মানব-অস্তিত্বের চৈতন্যনির্ভর জিজ্ঞাসা কবিতাটিকে করেছে গভীর তাৎপর্যবিশিষ্ট ও চিরকালীন।

পাঠ-৫

অমর একুশে

হাসান হাফিজুর রহমান
(১৯৩২-১৯৮৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাঙালি জাতির ভাষা, ঐতিহ্য ও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন কিভাবে কবিতার বিষয় ও শিল্পরূপ তৈরি করেছে, তা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- কবিতাটির ভাববস্তু ও শিল্পশৈলী আলোচনা করতে পারবেন।

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশের কাব্যধারায় হাসান হাফিজুর রহমান প্রগতিশীল, মননধর্মী ও আধুনিক কবি। দেশ বিভাগ-পরবর্তী বাংলাদেশের তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক । তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবদুল রহমান, মাতা হাফিজা খাতুন, তিনি পিতামাতার প্রথম সন্তান। পারিবারিক পরিবেশ ছিল সাহিত্যচর্চার উপযোগী, তিনি বাল্যকালেই গ্রাম ও নগর — উভয় পরিবেশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের শুরু। ১৯৪৬-এ তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে বি.এ. অনার্সে ভর্তি হয়েও পরীক্ষা দেননি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাস কোর্সে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষায় পাশ করেন।

হাসান হাফিজুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ছিল সক্রিয় ও বর্ণাঢ্য। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দমননীতি ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী ও আন্দোলনকারী।

পেশাগত জীবনে হাসান হাফিজুর রহমান প্রধানত সাংবাদিক ও এক পর্যায়ে কলেজের অধ্যাপক হিসেবে পাঠদান করেছিলেন। ১৯৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর পদে কাজ করেন।

তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা হচ্ছে তিনিই প্রথম 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) কাব্যসংকলন সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৬ খন্ডে প্রকাশিত হয় **'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিল পত্র'** (১৯৮২-৮৩)। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কাব্যাঙ্গনের তিনি একজন স্থপতি। বিশেষত, আধুনিক কবিতার প্রগতি ও মননধর্মী ধারার বিকাশক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। তিনি জনজীবনের প্রত্যাশা ও সংগ্রাম, ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণা ও কামনাবাসনা এবং বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে কাব্যবিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যসমূহঃ **বিমুখ প্রান্তর** [১৯৬৩], **আর্ত শব্দাবলী** [১৯৬৮], **অন্তিম শরের মতো** [১৯৬৮], **যখন উদ্যত সঙ্গীন** [১৯৭২], **বজ্রে চেরা আঁধার আমার** [১৯৭৬], **শোকার্ত তরবারী** [১৯৮২], **আমার ভেতরের বাঘ** [১৯৮৩], **ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী** [১৯৮৩]। এছাড়াও তিনি প্রবন্ধ গ্রন্থ ও গল্প সাহিত্যেরও রচয়িতা; প্রবন্ধঃ **আধুনিক কবি ও কবিতা** (১৯৬৫), **মূল্যবোধের জন্যে** (১৯৭০), **সাহিত্যপ্রসঙ্গ** (১৯৭৩), আলোকিত গহ্বর (১৯৭৭); গল্পগ্রন্থঃ **আরো দুটি মৃত্যু** (১৯৭০)।

হাসান হাফিজুর রহমান হার্ট, লিভার ও কিডনির ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসার জন্য মস্কো গমন করেন। সেখানে সেন্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে ১লা এপ্রিল ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ (১৯৭১) অন্যান্য পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করা হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে।

পাঠ পরিচিতি

হাসান হাফিজুর রহমান রচিত ' অমর একুশে' কবিতাটি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের সময়ে রচিত হয় এবং 'একুশে ফেব্রুয়ারী' কাব্যসংকলনে ১৯৫৩ -তে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি পরে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিমুখ প্রান্তর'-এ অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সংঘঠিত ভাষা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পটে লিখিত এ-জাতীয় আরও কবিতা রয়েছে। যেমন আব্দুল গাফফার চৌধুরীর ' আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী/ আমি কি ভুলিতে পারি,' আবু জাফর ওবায়দুলাহ রচিত ' মাগো ওরা বলে' ইত্যাদি। আলোচ্য 'অমর একুশে' কবিতাটি সেক্ষেত্রে সবচেয়ে শিল্পসফল ও যুগান্তকারী রচনা।

মূলপাঠ

॥ ১ ॥

আম্মা তাঁর নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর?

ঘূর্ণি ঝড়ের মতো সেই নাম উন্মথিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে, ডাকবে,
দুটি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনেও না? তবে হায়?

কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতোদিন?

আবুল বরকত নেই: সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো যে
তাঁকে ডেকো না;
আর একবারও ডাকলে ঘৃণায় তুমি কুঁচকে উঠবে –
সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার –– কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম;
এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে

বিচ্ছেদের জন্যে তৈরি হওয়ার আগেই
আমরা ওদেরকে হারিয়েছি ––
কেননা, প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না;
ভেবে ওঠার আগেই আমরা ওদেরকে হারিয়েছি
কেননা, প্রতিক্রিয়ার কৌশল এক মৃত্যু দিয়ে হাজার মৃত্যুকে ডেকে আনে।
আর এবার আমরা হারিয়েছি এমন কয়েকজনকে
যাঁরা কোনদিন মন থেকে মুছবে না,
কোনদিন কাকেও শান্ত হতে দেবে না;
যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কথা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতরে মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।

আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম! এক সার্ জ্বলন্ত নাম॥

॥ ২ ॥

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি;
দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছে তারই
পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে

দেখিয়েছ — বিদীর্ণ আভায় জ্বলেছিলে;
যে আভারই আকস্মিক স্পর্শে হয়তো
কহিতুর চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিল প্রাণপ্রার্থী প্রান্তরে প্রান্তরে।
দেশ আমার তোমার প্রাণের গভীর জলেস্নান করে এবার এলাম॥

তোমার প্রাণের গভীর জলেস্নান করে এবার এলাম;
শ্রমিক তার শিল্পে প্রতিভার স্বাদ মেশাতে পেরে
যে তৃপ্তিতে বিশাল হয়ে ওঠে তারই স্পর্শে পরাগ
সারা চেতনায় মেখে একবার আকাশের দিকে তাকালাম,
একবার তোমার গ্রাম যমুনার ঘোলা স্রোতে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে নিয়ে
লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ
শিখাগুলো দেখি,
কি আশ্চর্য প্রাণ ছড়িয়েছে — একটি দিন আগেও তো বুঝতে
পারিনি
কি আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছ —
একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারি নি, দেশ আমার॥

জন্মদাতা পিতার বাস্পস্তব্ধ চোখ দুটোকে একবার মনে করো,
একটি মাত্র ভাইকে হারিয়ে বোনের অকস্মাৎ আর্ত চিৎকারকে
সময়ের নিভৃত মন্দিরে সংগোপনে এসে যারা পরস্পরে
হৃদয়ের সততার কথা বলে গেছে
তাদের একজন আজ নেই

যুগল পাখির একটি আজ নেই

করুণ আঁখি হরিণী তার কোমল শাবকটিকে হারিয়েছে
সমুদ্রের আকুল ঢেউয়ের মতো সীমাক্লান্ত কান্না,
দিকে দিকে পাবিত কান্না দৃষ্টিমান তার চক্ষুকে হারিয়েছে
হে আমার জ্ঞান একটিমাত্র উচ্চারণের বিষ আমাকে দাও
যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়ায়
ওষধি জন্মের মতো একবার স্পন্দিত হয়ে যে ঘৃণা আর
কখনো মৃত্যুকে জানে না হে আমার জ্ঞান

আয়ুর প্রথম হৃদয়মন্থিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে
তারই সম্মানের জন্যে তাঁরা যূ   থবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
বুদ্ধ আর মোহাম্মদের দৃষ্টির মতো দীপ্তি
ফল্গুর মুখদেশের মতো উন্মথিত আবেগ,
আকাশের যে সাতটি তারা সমস্ত নীলিমার ভেতর চিহ্নিত হয়ে আছে
তাদের মতো অনন্য —
আর জীবনের শত্রু শয়তানেরা সেই পবিত্র দেহগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে
আর তাদের আত্মা এখন আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করি॥
তাঁদের একজন আজ নেই —
না, তাঁরা পঞ্চাশ জন আজ নেই —
আর আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে,

তাদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মতো
এক হয়ে গেছি,
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি॥

হে আমার দেশ, বন্যার মতো
সমস্ত অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে গড়িয়ে এনে একটি চেতনাকে
উর্বর করেছি;
এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবনের সন্ধি,
সমুদ্র সৈকতে দুঃসাহসী নাবিকের করোটির ভেতর যেমন
দূরদিগন্তের হাওয়া হাহাকার করে
তেমনি এখানে রয়েছে একটি কোমল নারীর আশাহত সখিনা হৃদয়
এখানে রয়েছে মা আর পিতা,
ভাই আর বোন, স্বজনবিধুর পরিজন
আর তুমি আমি, দেশ আমার!
এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের
ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি,
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষে থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি:
এবার আমরা তোমার॥

॥ ৩ ॥

বস্তীবাসিনী মা অকস্মাৎ স্বাস্থ্যবান একটি সন্তানকে বুকের কাছে ধরতে
পারলে
যেমন করে আহত দিনের অসংখ্য মৃত্যুকে ভুলে থাকতে পারে
তেমনি পঞ্চাশটি শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুকে ভুলেছি
মা, তোমাকে পেয়েছি বলে।
আজ তো জানতে একটুকু বাকী নেই মাগো,
তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও।

◆ ◆

বস্তুসংক্ষেপ

একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষাসংগ্রামে শহীদ সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের বেদনার সঙ্গে মিলে আছে শৃঙ্খলিত, লুণ্ঠিত স্বদেশমাতার রূপমূর্তি। সন্তানের নাম উচ্চারণের মধুর আনন্দ থেকে মাতৃকণ্ঠ বঞ্চিত। শাসকের দমন ও হত্যা তার কণ্ঠকে করেছে রুদ্ধ। শহীদ বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার— নামগুলো এখন তীক্ষ্ণ বর্শার ফলার মতো বেদনায় বিদ্ধ করেছে দেশের হৃদয়কে। তারা অকাল বিচ্ছেদের শিকার, প্রতিক্রিয়াশীল শত্রু তাদেরকে হননের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বকে পর্যুদস্ত করেছে। কিন্তু তাদের এই মৃত্যু দেশের আত্মাকে আরও অশান্ত ও প্রদীপ্ত করে তুলেছে, দেশের মানুষকে দীক্ষা দিয়ে গেছে সংগ্রাম ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য। এদের নামগুলো একই সঙ্গে বেদনা ও অগ্নিশিখার মত প্রজ্বলিত।

এই ভাষাসংগ্রাম কবিকে করেছে স্বদেশচেতন, ইতহাসলগ্ন এবং জীবনসংগ্রামী। কারণ মাতৃভাষার লড়াই থেকে তিনি দেশের মূল ও বিস্তৃত প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। জনতার গভীর হৃদয়ে কবি তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিকে চারার মত রোপন করেছেন, যা সোনালি ফসলে রূপান্তরিত হবে। দেশজ সত্তায় কবির ঘটেছে অবগাহন। এই দেশের পটভূমিতে রয়েছে কৃষক-শ্রমিকজনতা, রয়েছে জীবনসংগ্রামের সুকঠিন ক্ষেত্র, প্রকৃতির নদী-মাঠ-আকাশ। কবি একুশে ফেব্রুয়ারির মহিমায় আত্মসজাগ ও পরিশুদ্ধ হয়ে এই সুবিশাল দেশপ্রাণকে উপলব্ধি করতে পারছেন।

শহীদ সন্তানের মহান আত্মত্যাগ জাতিকে মহিমান্বিত ও সচেতন করেছে, কিন্তু পরিবারের পিতা মাতা ভাইবোনের জন্য বয়ে এনেছে স্বজন হারানোর দুঃখ। তবু এই মৃত্যু মাতৃভাষার জন্যে— মানুষ তার জন্ম ও মনুষ্যত্ব নিয়ে যে ভাষায় গৌরব ব্যক্ত করে, তারই সম্মানের জন্য এই আত্মবিসর্জন। তাঁদের মৃত্যু সমগ্র দেশকে একতাবদ্ধ করে গেছে। ভাষার

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই পরবর্তী সব লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু ও উৎসে রূপান্তরিত হয়েছে, অর্থাৎ দ্রোহচেতনার উজ্জীবন ঘটেছে। এখানে একুশে ফেব্রুয়ারির রাজনৈতিক তাৎপর্যের গভীরতাই ব্যক্ত করা হচ্ছে। মানুষ আজ একুশের শপথে উদ্দীপ্ত হয়ে জীবনমৃত্যুর সন্ধিলগ্নে, ইতিহাসের নবযুগে উপনীত। একদিকে স্বজনহারা পরিবারের বেদনা, অন্যদিকে দেশের বৃহত্তর জনজীবন — সবই একসূত্রে অবিচ্ছিন্ন-হৃদয়ে পরিণত। এই দরিদ্র, লাঞ্ছিত ও শোষিত দেশের মানুষ মাতৃভাষার লড়াই থেকে অর্জন করতে পেরেছে তার দাবি ও অধিকারের পরবর্তী সংগ্রামস্পৃহা ও রচনা করেছে মুক্তির ইতিহাস।

টীকা

একুশে — ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের **২১** ফেব্রুয়ারি সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসই এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। **১৯৪৭-** পরবর্তী পাকিস্তানে বাঙালি জাতি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উক্ত তারিখে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক প্রমুখ শহীদ হন। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির ভাষা-ঐতিহ্য রক্ষার ও সামগ্রিক মুক্তির লড়াই, যা পরবর্তীকালে অনেক লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সালাম, রফিকউদ্দিন, বরকত, জব্বার— এঁরা সবাই একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে শহীদ হন। এঁদের মধ্যে সালাম, রফিকউদ্দিন চাকরিজীবী, বরকত ছাত্র এবং জব্বার ছিলেন কৃষিজীবী। উক্ত আন্দোলনে দেশের সর্বস্তরের মানুষই আবেগাপুত ও কোন-না-কোনভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল।

সাতটি তারা— সপ্তর্ষিএন্ডল, আকাশের ঈশান কোনে অবস্থান করে। পুরাণমতে, ব্রহ্মার মানসপুত্র সাতজন ঋষির নামে এদের নামকরণ করা হয়েছে, যারা ধর্মব্যবস্থা ও লোকরক্ষা করেছেন। নামগুলো হচ্ছে মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। অসংখ্য তারকার মধ্যে এদের চিহ্নিত করার অর্থই হল এদের মহিমাকে স্বতন্ত্র করে দেখা। ভাষা-শহীদদের স্বতন্ত্র মহিমার জন্যই সাতটি তারা হিসেবে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

সখিনাহৃদয় — কারবালা যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচিত মীর মশাররফ হোসেনের ‘ বিষাদসিন্ধু’ গ্রন্থের চরিত্র। কারবালা যুদ্ধে সদ্যবিবাহিতা সখিনা বৈধব্যবরণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ‘প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না’ বাক্যটির অর্থ কি?

উত্তর : একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা- আন্দোলনে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন সালাম,বরকত, জব্বার প্রমুখ। তাদের মৃত্যুর জন্য স্বজন ও দেশবাসী প্রস্তুত ছিল না। এই মৃত্যু প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশক্তিরদ্বারা সংঘঠিত। জাতি ও দেশের উপরে নির্যাতন, শোষণ ও শাসনের ইতিহাস বাঙালিকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বারবার টেনে নিয়ে গেছে। প্রগতি ও মানবতার বিরুদ্ধ শক্তি কখনো মানুষের জীবন ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করেনা, বরং বিনষ্ট করে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সর্বদাই দলিত ও নিশ্চিহ্ন করে মানবতার বাণী।

২. জনতার গভীরে কবির অনুভূতি কেন রোপিত হয়েছে?

উত্তর : একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই হলেও এটি ছিল মূলত শোষিত, নিপীড়িত বাঙালি জাতির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রাম। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পীড়নই মানুষকে ভাষার প্রতীকে সংঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছিল। শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিল গোটা দেশের জনমানুষের সংস্পর্শ। কবির অনুভূতি জনতার জীবনমূলে সম্প্রসারিত হয়ে অর্জন করে রাজনৈতিক মাত্রা। জনতার সঙ্গে

কবির ঘটে গভীর সংযোগ । শোষণ, শাসন থেকে অস্তিত্বের মুক্তির প্রশ্নেই কবি তার হৃদয়কে রোপিত করেন জনতার জীবন ভূমিতে।

৩. শ্রমিকের 'শিল্পে প্রতিভার স্বাদ' — কথাটির তাৎপর্য কি?

উত্তর : শ্রম মানুষের হাতিয়ার এবং সভ্যতার চালিকাশক্তি। একজন শ্রমজীবী জীবন ও ইতিহাসের নির্মাতা । একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ও মুক্তির ইতিহাসস্রষ্টা । কিন্তু এই ইতিহাস শিল্পিত ও প্রতিভাস্পর্শে ঋদ্ধ। শ্রমিক যেমন তার কাজে বুদ্ধিমত্তা, আবেগ ও সৃষ্টিশীলতার সংযোগে শ্রমকে করে তোলে শিল্প, তেমনি একুশের সংগ্রাম কবিকে সেই সৃজনীপ্রতিভার বিশালত্ব ও তৃপ্তি দান করেছে। একুশের চেতনায় কবি হয়ে উঠেছেন ইতিহাস সৃষ্টির শ্রম, আবেগ ও পরিতৃপ্তির আস্বাদধন্য।

৪. 'এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবনের সন্ধি'— বক্তব্যে কি তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে ?

৫. 'তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও'— এই আকুলতা প্রকাশ করে কবি কি ইঙ্গিত করেছেন।

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. কৃষক যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালি শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি;

উত্তর : আলোচ্য পংক্তিসমূহ হাসান হাফিজুর রহমান রচিত 'অমর একুশে' শীর্ষক কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখানে কবি একটি চিত্রোপমার সাহায্যে জীবনের সঙ্গে নিজের চেতনার সৃষ্টিশীল সম্পর্কের কথা বলেছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন অস্তিত্ব, ঐতিহ্য ও চেতনা জগতের সংগ্রাম। যদিও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিই ছিল মুখ্য, কিন্তু একুশ ছিল বাঙালি জাতির নতুন ইতিহাসের জন্মলগ্ন, দিকবদলের ঊষাকাল। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ এই ইতিহাসের ঘটনায় আন্দোলিত ও সচেতন হয়েছিল। নাগরিক, ব্যক্তিমানুষ আত্মবিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে একুশের আন্দোলনে জনজীবনের সঙ্গে হয়েছিল বিজড়িত। সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সচেতন মানুষের থাকে যেসব প্রত্যাশা-স্বপ্ন-আদর্শ, সবকিছু বাস্তব রূপ পেতে পারে বৃহত্তর জীবন-স্পর্শে। একুশে ফেব্রুয়ারি সেই জীবনস্পর্শের ক্ষেত্র রচনা করেছে। কবি তাঁর আত্মগত অনুভূতির চারাগুলো সোনালি শস্যে রূপান্তরিত করতে চান। কৃষক বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে ধানের চারা রোপন করে নতুন ফসলের আশায়, কবিও তেমনি তাঁর অনুভূতির চারাকে জনতার গভীর ক্ষেত্রে বুনে এসেছেন যা নবজন্মের সূচনা ঘটাবে।

আত্মানুভূতি ও ব্যক্তিমন গণজীবনের মুক্তির মধ্যেই খুঁজে পায় চৈতন্যের মুক্তি, জীবনের স্বপ্নিল আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন।

২. এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষে থেকে কোটি কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি:

উত্তর: উপরিউক্ত পংক্তিগুলো কবি হাসান হাফিজুর রহমান রচিত 'অমর একুশে' কবিতার অন্তর্গত। এখানে কবি মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার সূত্রে আন্দোলন করার কথা বলছেন।

মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার লক্ষে একুশের ফেব্রুয়ারির সংগ্রাম ছিল জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। কেননা ভাষাহীন জাতির মৃত্যু ঘটে বেঁচে থেকেও। শাসক সর্বদাই জাতির কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য, শোষণ ও শাসনের জন্য ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। ঔপনিবেশিক ইংরেজ আমলেও তাদের ভাষাকে চাপিয়ে দিয়ে জাতির মাতৃভাষাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। পাকিস্তান পর্বেও আমরা দেখি শোষণের প্রথম আঘাত বাংলাভাষার উপরেই। কিন্তু মুক্তিকামী জাতিকে সে আঘাতের সঙ্গে লড়াই করেছে, এই লড়াই ছিল চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া অথবা কণ্ঠমুখর হয়ে বেঁচে থাকার লড়াই। বাঙালি মাতৃভাষার স্বপক্ষে দাড়িয়ে স্তব্ধতাকে বরণ করেনি, বরং কোটি কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। উর্দুভাষার আধিপত্য মেনে না নিয়ে তারা নিজের অস্তিত্বকে প্রবল শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইতিহাসের প্রান্তে জাতির জীবনমৃত্যুর সীমান্তে এই একুশে ফেব্রুয়ারি। সেই সীমান্তে বাঙালি জাতির কণ্ঠ প্রতিবাদী, সে জীবন উৎসর্গ করে রক্ষা করেছে মাতৃভাষার অধিকার।

৩. বস্তিবাসিনী মা আকস্মাৎ স্বাস্থ্যবান একটি সন্তানকে বুকের কাছে ধরতে পারলে
যেমন করে আহত দিনের অসংখ্য মৃত্যুকে ভুলে থাকতে পারে
তেমনি পঞ্চাশটি শহীদ ভাইয়ের অকাল মৃত্যুকে ভুলেছি
মা, তোমাকে পেয়েছি বলে।

৪. আয়ুর প্রথম হৃদয়মন্থিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে
তারই সম্মানের জন্যে তারা ব্যথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৪ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ (সংকেত)

কবিতা ব্যক্তিমনের আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনার রূপচিত্র হলেও জীবন, ইতিহাস ও সভ্যতার বৃহৎপটকে গ্রহণ করে থাকে। কখনও কখনও ইতিহাসের সন্ধিমুহূর্ত, জীবনদ্বন্দ্ব ও তুমুল ঘটনাপ্রবাহ কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের কবিতা জাতির আশা ও সংগ্রামের জগৎ নিয়ে অনেক বেশি মুখর। একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন আমাদের কবিতার বিষয়কে করেছে প্রাণবন্ত, জীবনঘনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক, আঙ্গিককে করেছে শব্দভাষা ও অলঙ্কারে বৈচিত্র্যময় ও নান্দনিক। হাসান হাফিজুর রহমান আধুনিক রীতি ও চৈতন্যনির্ভর। তাঁর 'অমর একুশে' কবিতাটি তারই শিল্পিত প্রকাশ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'অমর একুশে' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে জাতীয় অস্তিত্বের পর্বান্তর'। — আলোচনা করুন।
২. একুশের চেতনা রূপায়ণে কবি কি কি রূপক অবলম্বন করেছেন?
৩. 'অমর একুশে' কবিতার ছন্দরূপ আলোচনা করুন।
৪. 'অমর একুশে' কবিতার মূলবক্তব্য আলোচনা করুন।
৫. 'অমর একুশে' কবিতার শিল্পমূল্য নিরূপণ করুন।

১ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

'অমর একুশে' কবিতাটি একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের শিল্পময় অভিজ্ঞান। এখানে কবির চেতনা, আবেগ ও জীবনবাসনা ব্যক্ত হয়েছে উপমা-বর্ণনার বিস্তৃতপটে এবং তাতে চিত্রিত হয়েছে বাংলাদেশ ও জাতির ইতিহাস-পরম্পরার সংকেত । জাতিসত্তার স্বরূপ ও আকাঙ্ক্ষার রূপটি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে কবি একুশকে নিয়ে রচনা করেছেন অঙ্গীকারের দীপ্তরূপ ও দ্রোহচেতনা ।

কবি পর্ব থেকে পর্বান্তরে বহমান জাতীয় জীবনের বিকাশকে অঙ্কিত করেছেন। এই পর্বের সূচনায় রয়েছে মাতৃভাষার উজ্জ্বল ভান্ডার রক্ষার ইতিহাস যা মণিমাণিক্যে পূর্ণ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শত্রু জীবন ও মনুষ্যত্বকে হনন করে। বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাসও বারংবার এই রকম প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুর ছোবলে মৃত্যুগ্রস্ত, ভাষা ও ঐতিহ্য ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে আবৃত। কিন্তু বাঙালি এর বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে লড়াই করেছে, দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতা প্রতিবাদ ও সংগ্রামের পথে অস্তিত্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ইতিহাসও বাঙালির জাতিসত্তা ও মুক্তিসংগ্রামের রক্তক্ষরণের ইতিহাস, একুশের সংগ্রাম তারই প্রাথমিক ভিত্তি। রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘটিত এই সংগ্রামটিতে যুক্ত ছিল জাতির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশেরও লক্ষ। আলোচ্য কবিতায় কবি আত্মসচেতন জাতিসত্তার স্বরূপটি উন্মোচন করতে চেয়েছেন।

সন্তানের মৃত্যুতে জননী হারান তার প্রিয় নাম উচ্চারণের আনন্দ। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠি ভাষার অস্তিত্ব বিনাশের লক্ষে হত্যা করে প্রতিবাদী মানুষকে তথা প্রিয় কতগুলো নামকে । কিন্তু তারা রয়ে যায় দেশের প্রাণের দীপ্তির গভীরে এবং পরিবারের আবেগময় স্মৃতিজগতে। কৃষকের ধানের চারা রোপনের মত, শ্রমিকের শিল্পিত শ্রমের মত এবং এদেশের নদীপ্রবাহের পলিমাটির উর্বরতার মত শহীদের নামগুলো আমাদের চেতনার গভীরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তারা হয়ে ওঠে

এক একটি অভেদ্য বিশাল হিমালয়। শহীদের মা হয়ে ওঠেন দেশমাতৃকা। শোক থেকে ঘৃণা এবং তারপর দ্রোহচেতনা জাগরণের মধ্য দিয়ে কবিতাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সমষ্টিজীবনের উদ্বোধন। শহীদদের নাম উচ্চারণ করে কবি আবিষ্কার করেন মনুষ্যত্ব ও প্রতিবাদের গভীর দীক্ষা ও শপথের তাৎপর্য। ব্যক্তি তার বিচ্ছিন্নতা ও আত্মকেন্দ্রিক বৃত্ত উত্তীর্ণ হয়ে স্পর্শ করে দেশের মানুষের বিশাল প্রাণকে। একুশের ভাষা আন্দোলন এবং শহীদদের আত্মত্যাগ থেকে অর্জিত হয় সেই অভিজ্ঞতা, যা কবির চেতনায় সূচিত করে শৃঙ্খলিত স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম ও মৃত্যুবরণের আবেগ। এরই ধারাবাহিকতায় ঘটেছিল **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ, যে অর্থে 'অমর একুশে' আমাদের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। তবে কবিতাটির মূল বৈশিষ্ট্য হল পঞ্চাশের দশকে সমাজপ্রগতি, সমষ্টিচেতনা ও বাঙালির জাগ্রত সংগ্রামী-বিবেককে সাহসের সঙ্গে কাব্যগত করা। কবি এখানে স্পর্শ করতে পেরেছেন ইতিহাসেরদ্বান্দ্বিক গতিকে , যা মূল্যবহ করে বৃহত্তর জনজীবনের কল্যাণ লক্ষ্যে নিবেদিত সংগ্রামকে এবং সমবেত অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তাকে।

২ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

রূপকল্প হচ্ছে কবিতার অবলম্বিত শব্দাশ্রয়, যা দিয়ে ভাববস্তু রূপায়িত হয়। এই শব্দাশ্রয় গড়ে ওঠে উপমা-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতীক-বিশেষণ এবং ছন্দ কাঠামোর ভিত্তিতে। 'অমর একুশে' কবিতার ভাববস্তু সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, শোক ও তজ্জাত অভিজ্ঞান। এ-সবই বিমূর্ত আইডিয়া, যা প্রকাশের জন্য কবিকে সৃষ্টি করতে হয়েছে বিশেষ ধরনের উপমা ও বর্ণনাচিত্র। ভাব-অনুসারে রূপকল্পগুলোর উৎস- উপদানও যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতে তার নামটি মায়ের হৃদয়ে ধ্বনিত হতে থাকে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা নিয়ে, যেখানে শোক ও ক্ষোভের গভীরতা অবশ্যম্ভাবী। এই নাম ছিল একসময় মুক্তোর মতো উজ্জ্বল বিভায় শুভ্র ও জীবিত। এই শহীদ সন্তান — আবুল বরকত সংগ্রামের দীপ্ত আলোকে হয়ে উঠেছে বিশাল ও দীর্ঘ, তাই সে মধুর ক্যান্টিনের ছাঁদ ছুঁয়ে হাঁটত। মৃত্যু ও সংগ্রামের রূপকল্প হিসেবে কবি ব্যবহার করেন বর্শার তীক্ষ্ম ফলা, থোকা থোকা বিষণ্নতা।

বাংলাদেশ কৃষিজ সভ্যতার ধারক, আমাদের অভিজ্ঞতায়, সংস্কৃতিতে কৃষির রূপকল্পগুলো সর্বাধিক । কবিরও স্মৃতিতে রয়েছে পলিসিক্ত ক্ষেত, ধানের চারা, সোনালি শস্য, নদীর স্রোত ইত্যাদি। বিশেষভাবে কৃষকের রূপচ্ছবিকে তিনি নবজন্ম ও অনলস জীবনসৃষ্টির উপমা হিসেবে গ্রহণ করেন। একুশের অভিজ্ঞতায় কবির ব্যক্তিচেতনা দেশের প্রাণশক্তির সঙ্গে, জীবনের সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে তথা গণমানবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। ব্যষ্টি যুক্ত হয়েছে সমষ্টির সঙ্গে । এই অভিজ্ঞতার ইতিহাস রূপায়নে কবি ব্যবহার করেছেন পলিমাটির উর্বরতা, হিমালয়ের অভেদ্যরূপ । বস্তিবাসিনী মায়ের সন্তান-স্নেহের সঙ্গেও গড়ে ওঠে কবিচৈতন্যের ঐকাত্ম্য। প্রতিদিনের দুঃখ ও মৃত্যুর লাঞ্ছনাক্ষত ক্ষুদ্র জীবনকে মহৎ করে তোলে একুশের আত্মত্যাগ। ইতিহাস, জীবন মুক্তি ও দেশপ্রেম বিমিশ্র হয়ে 'অমর একুশে' কবিতার উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও রূপক সৃষ্টিতে সঞ্চার করেছে প্রকৃতি, বীরত্বের উপাখ্যান ও চলমান বাস্তবজীবনের দৃশ্য। জীবনের সঙ্গে কবিতার সংযোগ সৃষ্টিতে তাই 'অমর একুশে' সার্থক।